পায়ের দাগ

প্রবোধকুমার সান্যাল

বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গণেশ বসু

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রয়াল হাফটোন

চার টাকা

'উত্তরা' সম্পাদক

শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

প্রীতিভাজনেষু—

পায়ের দাগ

Payer Dag

By

Probodh Kumar Sanyal

4·00

খিড়কির পুরনো দরজাটা খুললেই পুবদিকে পাওয়া যেত সেদিনকার সেই মস্ত পুকুরের পাড়। তার ওপারে ছিল কচিদের ছোটখাটো খেলার মাঠ। মাঠের কোল ঘেঁষে চাল্‌তাবাগানের পথটা চলে গেছে, এবং তারই কোণে একটি ফটকওয়ালা বাড়ির বাঁ-হাতি পাঁচিলে পাথরের ট্যাবলেটে লেখা থাকত 'সুরধাম'। ওটা ডি-এল-রায়ের বাড়ি। ভিতরে ঢুকলেই বাঁ-দিকে ফুলবাগান। মালী কাজ করত বাগানে।

চালতাবাগান ধরে দু'পা গেলেই ডান-হাতি পাওয়া যেত কর-বাবুদের বাড়ি। ওই বাড়ির নিচের তলাটায় ছিল পাঠশালা। পাঠশালা পেরিয়ে ডানদিকের গলিতে ঘুরলেই চোখে পড়ত পাল্‌কির আড্ডা। তারপর সেই গলি চলে গেছে দক্ষিণে বড় রাস্তার দিকে। অনেকদিন সেই গলি হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল এক নিরীহ নির্বোধ বালককে। তার সেই সীমাহীন পথ কোথা দিয়ে কোন্‌দিকে কত দূরে গিয়ে শেষ হয়েছে, কোনদিনই তার হিসাব পাওয়া যায়নি। সেদিনের সেই পাঁচ বছরের ছেলেটা পাঠশালা ঢোকবার আগে একবার গলা বাড়িয়ে দেখে নিত ওই নিরুদ্দেশ পথের একটি সঙ্কেত। সেই গলিপথটি চাল্‌তাবাগানের কোল ঘেঁষে আজও আছে, কিন্তু আজও তার দূরত্বের আদি অন্ত মেলেনি।

বগলে একটি ছোট্ট মাদুর, হাতে একখানি স্লেট্ ও পেন্সিল, সঙ্গে বর্ণপরিচয় আর ধারাপাত,—মোট দশটি পয়সার অস্থাবর সম্পত্তি, কিন্তু ওই নিয়েই বোধ করি কেটে গিয়েছিল মাস ছয়েক। পাঠশালার যিনি সর্বেসর্বা,—সেই রঘু পণ্ডিতকে দেখে গায়ে জ্বর

আসত। এই পাট্টা চেহারা, রং কালো, চোখ ছুটো ভীমরুলের মতো, গলায় দীর্ঘবিলম্বিত সামবেদী পৈতার গোছা; আঙুলে রূপোর অঙ্গুরীয়, মুখের উপর সাংঘাতিক একজোড়া গোঁফ, পায়ে খড়ম—এবং ডান হাতে—ভাবতে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়,—মোটা একগাছা বেত। রঘুপণ্ডিতের খড়মের আওয়াজটি এগিয়ে এলে হৃৎকম্প হ'ত।

ভীরু খরগোসের মতো সেই নাবালক ছেলেটা সযত্নে ছোট্ট মাছুরটি দেয়ালের কোণে বিছিয়ে তার ওপর বই-স্লেট্ নিয়ে ব'সে যেত। গুরুমশাই বসতেন সকলের মাঝখানে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। শীতকালে মাস ছুই তাঁর গায়ে থাকত ফিতে-বাঁধা বেনিয়ান্, বাদবাকি সময় আলগা গা। চওড়া বুকে একরাশি কালো লোম, সেই লোমের রাশি ছুই হাতের প্রায় কব্জি পর্যন্ত নেমে এসেছে।

পাঠশালায় ওই ছুখানা বই নিয়েই হাতে খড়ি। ওই ছুখানা বইয়ের বাইরে বিদ্যার জগৎ চলে গিয়েছে 'বোধদয় শিশুশিক্ষা চারুপাঠ কথামালার' ভিতর দিয়ে। কিন্তু সেই জগতের পথ ছিল বড় জটিল। সেই পথ অন্তহীন। অসমসাহসিক যারা সেই পথে পা বাড়িয়েছিল সেদিন, যাদের পাঠ্যতালিকায় ওগুলো সেদিন সহজ হয়ে গেছে, তাদের দিকে শ্রদ্ধা ও ঈর্ষামিশ্রিত ছুটি কচি চোখ জেগে থাকত। তারা প্রতিভাধর পুরুষ। স্বপ্নে দেখা যেত তা'রা দিব্যজীবন লাভ করেছে।

শাসন-বাঁধন-কাঁদনের ভিতর দিয়ে পাঠশালার সেই বিস্মৃত-প্রায় জীবন শেষ হতে লেগেছিল মাস ছয়েক। হয়ত বা আরও কিছু বেশি। সর্বমনপ্রাণে এই কথাটা সেদিন বুঝতে পারা গিয়েছিল, বই মানেই পাঠ্য বই,—যে-বই পড়তে তুমি বাধ্য,—সেই বইয়ের বাইরে আরও কিছু আছে,—যা অনাবশ্যক, যা অহেতুক,—তার কোনও সন্ধান কিন্তু জানত না ওই অর্বাচীন ছেলেটা।

নেমে আসত একদিন শ্রাবণের বর্ষা। প্রায়ান্ধকার বিষন্ন আকাশ থেকে সেই জলের ধারা নামত রেলতলার ছাদে আর পুরনো পাঁচিলে। নারকেল গাছের উপরে চিল ব'সে ভিজত, কচিদের সেই মাঠ ভরে যেত জলে, প্রাচীন ভিটের ফাটল দিয়ে নামত সেই জল। উত্তরদিকের নিমগাছটা বৃদ্ধ তপস্বীর মতো মাথা দোলাত। ভিজে-ভিজে গন্ধে ভরে যেত সেইদিনের শৈশবের সংসার।

ঘরের সামনে রেড়ির তেলের আলো জ্বেলে মা পড়তেন 'প্রহ্লাদ চরিত্র।' দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বালক পুত্র ছিল প্রহ্লাদ। কিন্তু সে ছিল ভগবদ্ভক্ত। শত লাঞ্ছনা উৎপীড়ন অনাদর হ'ত তার সেই ভক্তির জন্য। কেমন ক'রে এই বালককে ঈশ্বর-ভক্তির থেকে মুক্ত করা হবে, এই ছিল দৈত্যকুলের সমস্যা। কিন্তু বালকের শক্তি আশ্চর্য ও অলৌকিক। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবকে সে দর্শন করে নিত্য, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার অটুট অনুরাগ, ভক্তি ও পূজায় তা'র হৃদয় পরিপূর্ণ। ভয়, সঙ্কট, বিভীষিকা, মৃত্যুযন্ত্রণা, অগ্নির লেলিহান শিখা,—এদের সকলের মাঝখানে বালক প্রহ্লাদ কিন্তু অটল। দৈত্যকুলে প্রবল বিপ্লব দেখা দিল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ক্রোধে হিংসায়, ঘৃণায়, উত্তেজনায়—একেবারে দানবীয় চেহারা ধারণ করলেন। রাজদরবারের এক প্রস্তাবে স্থির হ'ল, প্রহ্লাদকে জলে ডুবিয়ে মারা হোক। শিলা বেঁধে দাও ওই ক্ষুদ্র দেহের সঙ্গে। অগাধ নদীতে ওকে ভাসিয়ে দিয়ে এস। কিন্তু 'রামনামে জলে শিলা ভাসে, শমন গলায় ত্রাসে!' পাথরের শিলা ভাসছে নদীতে, প্রহ্লাদও ভাসছে সেই শিলার উপরে বসে। এসেছে ঝঞ্ঝা সেই নদীতে, এসেছে প্রবল বন্যা। দৈত্যের মতো মেঘ উঠেছে সেই নদীতে, তরঙ্গে-তরঙ্গে আহত-প্রতিহত, দুই পারের দুই কুল হারিয়ে গেছে অন্ধকারে,—আর সেই কুটিল ক্রুর ক্রুদ্ধ জলধির আবর্তে-আবর্তে

পাক খেয়ে ভেসে চলেছে প্রহ্লাদ। পরম অনুরাগ তার দুই চোখে, অধরে মধুর স্নিগ্ধ হাসি, বুকের মধ্যে তা'র কালজয়ী নির্ভর বিশ্বাস! অন্তরীক্ষে বাসুদেব এসে দাঁড়ালেন।

প্রহ্লাদের মৃত্যু হ'ল না। দেবতার অভয় মন্ত্র জপ করে সে নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে উঠে এল। অবশেষে একদিন ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন, বল্ তোর ঠাকুর কোথায়? দেখাতে পারিস আমাকে? বলতে পারিস রাজবাড়ির ওই থামের মধ্যে তোর ভগবান আছে? বল্ নৈলে নিজের হাতে তোকে কাটব।

চোখ বুজে জপে বসে গেল প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুর অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল। দিব্যবিশ্বাসের নিবিড় দৃষ্টিতে প্রহ্লাদ তাকাল সেই থামটির প্রতি। পরে সে বললে, হ্যাঁ, ওই থামের মধ্যেও তিনি আছেন। তিনি যে সর্বব্যাপী!

দৈত্যরাজ কুঠারের আঘাত হানলেন সেই থামের উপরে,— তবে বেরিয়ে আয় দেখি কোথায় তোর ঠাকুর।

কেঁপে উঠল পৃথিবী। দেবতারাও সন্ত্রস্ত। দৈত্যরাজের দাপটে এবার সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। প্রহ্লাদ করযোড়ে সকরুণ প্রার্থনা জানাল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। ভক্তের মান তুমি রাখ প্রভু।

প্রচণ্ড বিদারণ ঘটল সেই স্তম্ভে। তারই ভিতর থেকে শ্রীবিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নরসিংহদেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর উপরের অংশটা সিংহের, নিম্নভাগ মানুষের। হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে তাঁর প্রবল সংগ্রাম বেধে গেল। অবশেষে সেই নরসিংহরূপী ভগবান তাঁর জানুর উপরে হিরণ্যকশিপুকে ফেলে তা'র দেহকে ছিন্নভিন্ন করলেন। অসুরের বিনাশ ঘটল। দেবলোকে শঙ্খ বেজে উঠল। অশ্রু গড়িয়ে এল বালক প্রহ্লাদের দুই চোখে।

প্রহ্লাদচরিত্র নিয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আর কোনও বইকে যেন অমন একান্ত আপন বলে মনে হয়নি। বেশ মনে পড়ে ওই বইখানার সঙ্গে সেদিনকার নিবিড় বন্ধুত্ব অনেকবার বিবাগী মনকে টেনে নিয়ে গেছে পথে ও বিপথে দুর্গমে ও দুস্তরে। মধুলোভী মৌমাছি যেন বইখানার প্রতিটি শব্দের থেকে অহরহ তার খাদ্য আহরণ করেছিল। সেই মনই পরে অমৃতের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে 'ধ্রুব'-র সঙ্গে দধিভাণ্ড হাতে নিয়ে মধুসূদনদাদার অন্বেষণে। চলে গেছে সে শ্রীবৎস-চিন্তায়, নল-দময়ন্তীতে, বেহুলা-লখিন্দরে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের অন্ধকার শ্মশানে। ওগুলো বই শুধু নয়, বিশ্বাস বটে। চিন্তার আশ্রয় শুধু নয়,—ভাবেরও পথনির্দেশক। জীবন-কল্পনায় ওদের অনস্বীকার্য অস্তিত্বের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি পরম সত্য,— বাইরের শত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যার থেকে উপলব্ধ জ্ঞানের বিচ্যুতি ঘটতে চায় না। ওরা ভিত্তি রচনা করেছে মহৎ শিক্ষার।

শৈশবকালের সেই দিশাহারা মন খুঁজতে চেয়েছিল কিছু নতুন আবিষ্কার, চিত্তের নতুন প্রসাদ।

একাদশীর দিনে বাড়িতে রামায়ণ পাঠ হত। আদি আর অযোধ্যাকাণ্ড প্রায় শেষ হতে চলল। কেঁদে কেঁদে পাগলিনীর মতো ছুটল কৌশল্যা অযোধ্যার রাজপথে পুত্রবিচ্ছেদের বেদনায়। কাঁদল প্রজাগণ, কাঁদল পশুপক্ষী, কাঁদল পিপীলিকা-পতঙ্গের দল। তারপর অরণ্য আর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মন ছুটল নিজের পথ ধ'রে। বনে, প্রান্তরে, পর্বতে, সাত সমুদ্রে, সুমেরু আর কুমেরুলোকে। শুনছি, অথচ শুনছিনে। ঘুমে জড়িয়ে গেছে চোখ, স্বপ্নে মিলিয়ে গেছে মন,—কিন্তু তবু স্থির থাকতে পারেনি সে,—ওই যাকে আজ বলা হচ্ছে বাসাছাড়া পাখী! দুটি নিরুপায় রাজপুত্র চলেছে সীতার অন্বেষণে,—অরণ্যে, পর্বতে, নদীর তটে-তটে,—তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তাদের অশরীরী

সহযাত্রী একটি নাবালকের আকুল-ব্যাকুল প্রাণ। বাসাছাড়া বিবাগী পাখী!

রামায়ণের ওই ছুটি কাণ্ড থেকে একদা পরম মন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। তাকেই বোধ হয় বলে, বীজমন্ত্র,—আপন দেহের রক্তগঙ্গার তীরে তীরে সেই বীজমন্ত্র ছুর্বোধ্য ভাষায় জপ করে গেছে সেদিনের সেই ক্ষুদ্র শিশু।

শৈশব থেকে বালককালে এসে পৌঁছতে কতদিন লাগল মনে পড়ে না। বোধ হয় যুগ থেকে যুগান্তর। পাঠ্যপুস্তকের গোলক ধাঁধায় ঘুরছে মন—যার আবেষ্টন থেকে মুক্তিও নেই এবং যার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধও নেই। ঠিক এমনি সময়টায় এসে দাঁড়ালেন সামনে এক কাকা তারাকুমার ভাদুড়ী।

বেড়াতে যাবি? চল্ যাই—

কোথায় যাব সে-প্রশ্ন ওঠে না ক্ষুদ্র বালকের মনে। স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদের মতো সেই অভিযান,—সেখানে দায় নেই, বাধ্যবাধ্যকতা নেই, এবং সেটি শাসন বহির্ভূত সাবলীলতায় ভরা।

মেছোবাজারে রিপন থিয়েটারে সেই প্রথম সিনেমা-ছবি দেখা। বাঙ্ময় নয়, শব্দময়। বৃষ্টির মতো শব্দ হচ্ছে ছবিতে, সে ছবি ঠাহর করা যায় না এত চঞ্চল,—এবং সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে যেন চিকের পর্দার আড়ালে। চোখে যন্ত্রণা হতে থাকে। ইংরেজি নির্বাক ছবি। তার আগাগোড়া অসম্ভব এবং অবাস্তব ঘটনায় ভরা। আর কিচ্ছু মনে নেই।

ফিরবার পথে একটি বইয়ের দোকানে উঠে কাকা বললেন, দেখছিস কত রকমের বই? যত খুশি বই নে। বল্ কি কি নিবি।

বাঁশবনে ডোম কানা! নানা রঙে রঙীন সেই দোকানঘর। কোন্‌টি সরিয়ে কোন্‌টির দিকে হাত বাড়াতে হবে—সে এক

সমস্যা। অনেককাল ধরে এ-দোকানে যারা বসে থাকার সুবিধা পায় তারা ভাগ্যবান। কিন্তু ওই সুযোগে আরেকটা বিচিত্র জগৎ তার দ্বার খুলে হাসিমুখে সামনে দাঁড়াল। শুধু চেয়ে নেওয়া গেল 'হাসিখুশী' আর 'ছবি ও গল্প'। ভয়ে ভয়ে আর একখানার দিকে বাধ্য হয়ে হাত বাড়াতে হল, সেটি 'দাদামশায়ের থলে'।

সেই থেকে শুরু হল আনন্দযাত্রা। গ্রন্থকার সেখানে কেউ নয়, চিনিনে তাকে। কিন্তু 'রামধন' তার সমস্ত চরিত্রের অপার বিস্ময় নিয়ে হাজির হত চোখের সামনে। পরী, রাক্ষসী, রাজপুত্র রাজকন্যা, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, এদের অস্তিত্ব কোথাও কোনদিনই নেই,—কিন্তু এরা সবাই মিলে কালজয়ী সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে কল্পনায় আর চিন্তায়, ধ্যানে ও ধারণায়। এরা সেদিনের বালকের সংসারকে অপরূপ করে তুলেছিল, সারাদিনের অর্থহীন খেলার জগতে এরা এসে আসর জমিয়েছে, কানে কানে কথা বলেছে, অহেতুক আনন্দের সহযাত্রী হয়েছে।

চাল্‌তাবাগানের আঁকাবাঁকা গলিপথে অনাবশ্যক কাজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে একা মনে যখন তখন। কালোয়ারদের বস্তির প্রান্তে একটি বাড়ির নীচের তলায় ছিল বাসস্থান। উপরতলায় থাকতেন বাড়ুয্যে মশাইরা—তাঁরা বাড়িওয়ালা। নীচের তলায় ভাড়াটে। প্রাচীন ইমারত—চুনবালিধসা। ছায়ান্ধকার নীচের তলায় সর্বদা গা ছমছম করত। চারদিক চাপা অবরোধে আচ্ছন্ন।

একদা সেইখানে বসে হাতে এল 'ছোটদের মহাভারত'। কবিকল্পনা নয়, রূপক নয়—অলৌকিক ভেল্‌কির ফাঁকি নেই কোথাও। এক বিরাট বাস্তব জীবনের কাহিনীর মধ্যে মন বসে গেল। প্রত্যেকটি মানুষকে চিনতে দেরি হয়নি—নির্ভুল রূঢ় সত্যের উপর যার প্রতিষ্ঠা। সেই বিপুল জীবন-কাহিনীর সঙ্গে

নিজের প্রাণের অসীম ক্ষুধাটাও কেমন করে যেন জড়িয়ে গেল। ওই বনস্পতির অগণিত শাখাপ্রশাখায় সমগ্র সত্তা বাঁধা পড়ল। অনুপ্রেরণা লাভের অত বড় ক্ষেত্র পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই অতি বিরল।

সন্দেহ নেই, অনন্ত পিপাসাকে জাগিয়ে তুলেছিল ওই ছোটদের মহাভারত। মহাভারত চিরকালের আধুনিক বলেই ওর উপরে ছাপ রয়েছে চিরন্তনের।

এর পরেই ত' দেখি, জীবন-মহাকাব্যের পৃষ্ঠা খোলা রয়েছে চোখের সামনে। সেখানকার প্রতিক্ষণের বৈচিত্র্য চোখ খুলে দিয়েছে পলকে পলকে। সে-বৈচিত্র্যের শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মানুষ অনন্ত কাব্য ও কাহিনীর প্রতীক্।

লেখক-জীবনের আদি পর্বে এই উপলব্ধিই সত্য হয়ে রয়েছে।

কারো মন স্থাণু কারো সচল। তা নিয়ে নালিশ কিছু নেই। যে-শিশু হাঁটতে শিখেছে, সুবিধা পেলেই সে হাঁটবে,—বাধা দিলে শুনবে না। অনেক প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখেছি, তারা কেবলই তীর্থে যাবার সঙ্গী খোঁজে। সুবিধা পেলে আর পিছনে তাকায় না, পথে বেড়িয়ে পড়ে। তীর্থের আকর্ষণটা বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু পথের আকর্ষণ অনেক বড়। কত মানুষ, কত বৈচিত্র্য, কত নতুন দেশের হাওয়া, কত অজানার হাতছানি,—এরা সবাই ডাকে। কিন্তু সেই ডাক সবাই শোনে না। যার রক্তের মধ্যে আছে গতিবেগ, এবং প্রাণের মধ্যে আত্মতাড়না,—তার কানে আসে ওই ডাক। শুধু ঘর ছেড়েই যে সে বেরোয় তাই নয়, নিজেকে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে পালায়। ভাববার আগেই বেরিয়ে পড়ে।

ভ্রমণের মূল কথাটা এইখানে।

একটি বালক যদি ঘর ছেড়ে বেরোয়, তার পক্ষে থাকে ভিন্ন কথা। সে আবিষ্কার করতে করতে চলে,—যা কিছু সে পায় তাই তার পক্ষে নতুন। প্রত্যেকটিই তার অভিজ্ঞতা, প্রত্যেকটি নতুন সংগ্রহ,—সেই হ'ল তার প্রকৃত শিক্ষা। বইয়ের মধ্যে বিশ্বকল্পনা আছে, কিন্তু ঘরের বাইরে রয়েছে জলজ্যান্ত বিশ্ব, সেই হ'ল জীবনের প্রথম পাঠ্য! ভ্রমণ তখনই সার্থক, বাইরের সৌরবিশ্বের সঙ্গে প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভ্রমণ হ'ল গতানুগতিক জীবনের গতি এবং চলমানতা, সেইজন্য পদযাত্রী মাত্রই আমাদের নমস্য। এই গতি আমাদের দেশে একটি পরিণতি পায় তীর্থযাত্রায়। তখন আর এ গতি নিরর্থক

নিজের প্রাণের অসীম ক্ষুধাটাও কেমন করে যেন জড়িয়ে গেল। ওই বনস্পতির অগণিত শাখাপ্রশাখায় সমগ্র সত্তা বাঁধা পড়ল। অনুপ্রেরণা লাভের অত বড় ক্ষেত্র পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই অতি বিরল।

সন্দেহ নেই, অনন্ত পিপাসাকে জাগিয়ে তুলেছিল ওই ছোটদের মহাভারত। মহাভারত চিরকালের আধুনিক বলেই ওর উপরে ছাপ রয়েছে চিরন্তনের।

এর পরেই ত' দেখি, জীবন-মহাকাব্যের পৃষ্ঠা খোলা রয়েছে চোখের সামনে। সেখানকার প্রতিক্ষণের বৈচিত্র্য চোখ খুলে দিয়েছে পলকে পলকে। সে-বৈচিত্র্যের শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মানুষ অনন্ত কাব্য ও কাহিনীর প্রতীক্।

লেখক-জীবনের আদি পর্বে এই উপলব্ধিই সত্য হয়ে রয়েছে।

কারো মন স্থাণু কারো সচল। তা নিয়ে নালিশ কিছু নেই। যে-শিশু হাঁটতে শিখেছে, সুবিধা পেলেই সে হাঁটবে,—বাধা দিলে শুনবে না। অনেক প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখেছি, তারা কেবলই তীর্থে যাবার সঙ্গী খোঁজে। সুবিধা পেলে আর পিছনে তাকায় না, পথে বেড়িয়ে পড়ে। তীর্থের আকর্ষণটা বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু পথের আকর্ষণ অনেক বড়। কত মানুষ, কত বৈচিত্র্য, কত নতুন দেশের হাওয়া, কত অজানার হাতছানি,—এরা সবাই ডাকে। কিন্তু সেই ডাক সবাই শোনে না। যার রক্তের মধ্যে আছে গতিবেগ, এবং প্রাণের মধ্যে আত্মতাড়না,—তার কানে আসে ওই ডাক। শুধু ঘর ছেড়েই যে সে বেরোয় তাই নয়, নিজেকে টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে পালায়। ভাববার আগেই বেরিয়ে পড়ে।

ভ্রমণের মূল কথাটা এইখানে।

একটি বালক যদি ঘর ছেড়ে বেরোয়, তার পক্ষে থাকে ভিন্ন কথা। সে আবিষ্কার করতে করতে চলে,—যা কিছু সে পায় তাই তার পক্ষে নতুন। প্রত্যেকটিই তার অভিজ্ঞতা, প্রত্যেকটি নতুন সংগ্রহ,—সেই হ'ল তার প্রকৃত শিক্ষা। বইয়ের মধ্যে বিশ্বকল্পনা আছে, কিন্তু ঘরের বাইরে রয়েছে জলজ্যান্ত বিশ্ব, সেই হ'ল জীবনের প্রথম পাঠ্য! ভ্রমণ তখনই সার্থক, বাইরের সৌরবিশ্বের সঙ্গে প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভ্রমণ হ'ল গতানুগতিক জীবনের গতি এবং চলমানতা, সেইজন্য পদযাত্রী মাত্রই আমাদের নমস্য। এই গতি আমাদের দেশে একটি পরিণতি পায় তীর্থযাত্রায়। তখন আর এ গতি নিরর্থক

নয়, লক্ষ্যহীন নয়,—এ গতি সার্থক হয় মানুষের মহৎ ভাবনায়।

অতি শৈশবে এক বৃদ্ধাকে দেখতুম বিশেষ বিশেষ পাল-পার্বণে। তিনি ছিলেন আমার দিদিমার গুরুমা। বাড়ী ছিল তাঁর ভাটপাড়ায়, কলকাতায় এসে উঠতেন জোড়াসাঁকোর এক বাড়ীতে, অথবা দিদিমার ওখানে। আমার যখন শৈশব, তখন তাঁর বয়স নব্বই। গুরুমার বাল্যবয়সে নাকি জীবিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহনের পাড়ায় ছিল আমাদের মামার বাড়ী,—পুঁটিবাগানের ধারে, চাল্‌তাবাগানের মোড়েই।

সে যাক্। গুরুমা বলতেন, তাঁর ভাটপাড়া থেকে কাশী গিয়ে পৌঁছতে লেগেছিল নাকি মোট ছয়মাস। পাকা রাস্তার কথাটা তখনও পাকা হয় নি। কিন্তু রাস্তা ছিল বেশ ভালো। তবু ভালো রাস্তা আর নিরাপদ রাস্তা এক কথা নয়। তখন ভাটপাড়া থেকে কলকাতার পথেই ছিল নাকি অনেক গণ্ডগোল। ডিঙ্গি চড়ে বিল পার হ'তে হ'ত। চারদিকে বন-বাঁদাড়। পথে সাপের ভয়। ভাঙ্গোড় থেকে পাতিপুকুর পর্যন্ত বাঘের উপদ্রব। বেলঘোরে ছিল ডাকাতের পল্লী। পাইকপাড়ার তিনদিকে গভীর জঙ্গল। লুটেরা থাকতো যেখানে সেখানে। দল বেঁধে না বেরোলে রক্ষা ছিল না। প্রকৃত কলকাতার তখন জন্ম হয় নি।

এই ভূমিকাটুকু ক'রে গুরুমা তাঁর কাশীযাত্রার কাহিনী বলে যেতেন। অনেক রাত পর্যন্ত দিদিমা শুনতেন সেই আশ্চর্য কাহিনী। হুগলী আর বর্ধমানের ইতিহাস, প্রাচীন 'বেনারস রোডের, ইতিবৃত্ত, 'সিরাজদ্দৌলার রাজপথের গল্প'। প্রশ্ন ওঠে না কিছু কেন না সব নিয়েই ভ্রমণ। গুরুমার গল্পে পাই গ্রামের জীবন, সমাজের চেহারা, মানুষের পরিচয়, খাল-বিল-নদী-জলার আশ্চর্য ছবি, পাল-পার্বণ-মেলা-উৎসব প্রভৃতির আনুপূর্বিক বিবরণ, দুস্তর ও দুঃসাধ্য পথের কথা! ওরই সঙ্গে পাচ্ছি নতুন দেশের আকাশ,

অনুভব করছি হাওয়া-বদল, আস্বাদ করতে পাচ্ছি জীবনের গতিশীলতা, বাইরের ছুনির্বার টান। তাঁর সেই ভ্রমণকাহিনী বর্ণনায় পথে-পথে মন্দিরে-দেউলে শাঁখ-ঘণ্টা-কাঁসরের আওয়াজ পর্যন্ত যেন কানে শুনতুম।

ছয় মাসে কাশী পৌঁছবার কাহিনী সম্পূর্ণ বলতে অন্তত ছয়দিন ও ছয় রাত্রি লাগতো। রেড়ির তেলের আলোটা কোন্ এক সময় নিভে যেতো মাঝরাত্রে। ঘুম না আসা পর্যন্ত চেয়ে থাকতুম অন্ধকারে, আর দেখতে পেতুম এক বৃদ্ধা পুঁটলি হাতে নিয়ে প্রবল প্রতিজ্ঞা সহকারে চলেছে দেশ-দেশান্তর জলাবিল বনজঙ্গল পেরিয়ে কাশীধামের পথে। নব্বই বছরের গুরুমার সেই ধূলাধূসর তুই পায়ের পিছনে-পিছনে যেতো আমার ব্যাকুল মন। শুধু দেখতুম অন্ধকারে সেই তু'খানা পা,—গতি তার অশ্রান্ত, সে যেন থামতে জানে না, তার বিরতি নেই, পরিণতি নেই। সেই পা তু'খানা আজও অনুসরণ করি।

পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ভূগোল ছিল সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এটি জানতে পারলুম—যখন ভূগোল পড়ার আর বিশেষ দরকার রইল না। ভূগোল মুখস্থ করি নি কোনদিন, কিন্তু সমস্ত বিষয়টি কেমন যেন উপলব্ধির মধ্যে পেতুম। পৃথিবীর কথা অনেক বড়, সে এখন থাক্ —আমরা অনেকেই ভারতবর্ষের খবর জানি নে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, রেলপথের বাইরে হ'ল প্রকৃত ভারতবর্ষ,—যার সঙ্গে আমাদের যোগ হ'ল কণামাত্র। রেলপথ প্রত্যেকটি প্রদেশ তথা রাজ্যকে সংযুক্ত করেছে মাত্র, কিন্তু একের সঙ্গে অপরের সামাজিক এবং আত্মিক যোগ স্থাপন করতে এখনও সমর্থ হয় নি। দূর প্রদেশের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, আমাদের গায়ে গায়ে যারা রয়েছে, অর্থাৎ আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা—এদেরকে আজও আমরা সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পারি নি। জানার চেয়ে অজানার পরিমাণ রয়ে গেল অনেক বেশী।

ছোটবেলাকার ভূগোলে যে-ভারতবর্ষকে দেখতুম গুরুমার সেই দু'খানা ধুলোবালি মাখা পা অনুসরণ ক'রে যে-বিরাট ভূভাগকে মনে মনে আবিষ্কার করতুম, আজ সেই ভারতবর্ষ অনেকটা ছোট হয়ে গেছে! আজ রেলপথ এবং বিমানপথের কৃপায় এবেলা ওবেলায় আমরা ভারতকে একটি একটি অংশে দেখে নিতে পারি। কিন্তু বিমানযোগে এবং রেলপথে এই বিস্তৃত উপমহাদেশকে দেখা সত্য দেখা নয়। উৎসবের আসরে গিয়ে পাত পেতে ভোজন ক'রে আসা যায়, কিন্তু তাতে আত্মীয়তা ঘটে না। ঔদাসীন্যের দ্বারাই মানুষ সর্বাপেক্ষা দূরত্ব সৃষ্টি করে। সব চেয়ে তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান জ্ঞানের ক্ষেত্র নিহিত থাকতে পারে,—এই সাধারণ কথাটা বিজ্ঞানেও সত্য, জীবনেও সত্য।

গুরুমার গল্পের মধ্যে আর যাই থাক্, উচ্চশিক্ষা পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগভীরতা অথবা উপদেশ—কোনও কিছুই থাকত না। উচ্চশ্রেণীর কথক যেমন শ্রোতাকে ধরে রাখে, তেমন বিদ্যাও তাঁর ছিল না। কথা কইতে গিয়ে কথায়-কথায় তাঁর ভ্রমণের গল্প এসে পড়তো। শোনাতেন না, ব'লে যেতেন মাত্র। অপরের ঔৎসুক্য জাগাবার চেষ্টা নেই, শুনতে ভালো লাগছে কিনা তার খোঁজ রাখতেন না,—তিনি তলিয়ে যেতেন তাঁর গল্পে।—

"তালের বন পেরিয়ে তবে ত গাঁ খুঁজে পাবো! সামনে পড়লো মস্ত বিল্। ভাদ্দর মাসের জল একেবারে কুলোকুলি। ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে এলো, শ্যা'ল-কুকুর ডেকে উঠলো!···ডিঙ্গি আর খুঁজে পাই নে। ডিঙ্গি পাই ত লোক নেই! ঘাটের ধারে ব'সে হাপুসে কান্না এলো, মা! জপের মালা বার করলুম থলি থেকে!"

জরাগ্রস্ত লোলচর্মা দন্তবিহীন ওই বৃদ্ধার গল্পটুকুর ভিতর দিয়ে

যেদিন যে-মন্ত্র ধ্বনিত হ'ত মর্মে মর্মে, তার অনুরণন ছিল অনেককাল। ওই মস্ত বিলের ধারে, ওই তালবনের আনাচে কানাচে, ওই আসন্ন সন্ধ্যার রঙীন আকাশের নীচে শিয়াল-কুকুর ডাকা অজানা ভূভাগে গুরুমার অভিযানের ওই দুঃসাহসিক পথে সেদিনকার বালকের মনও সমস্ত শাসন বাঁধন ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তো। সেই গল্পটাই যেন আজ রূপকথার মতো। সেই মস্ত বিলের ধার আজও রয়ে গেছে এক মায়াচ্ছন্ন লোকে,—যেখানে এই বৈজ্ঞানিক যুগেও পৌঁছনো যায় না, কোনও রেলপথ যেখানে নেই, বিমান যে আকাশ আজও খুঁজে পায় নি, এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযাত্রিক যেখানে পৌঁছতে গিয়ে হার মেনেছে।

বনের ধার দিয়ে গুরুমা চলেছেন। বনজঙ্গলে তখনকার দিনে নাকি ডাকাতরা থাকতো লুকিয়ে। কোম্পানীর আমলে তখন টুঁ শব্দটি করবার উপায় ছিল না। সঙ্গে আর কি থাকবে, মা? চারটি কড়ি ছিল আমাদের পুঁটলিতে। তাই যদি নেয় ত নিক্, কপাল যাবে সঙ্গে। তা যাই বলো, নির্বিঘ্নে বন পেরিয়ে চ'লে গেলুম। হাটতলা যদি এলো, তবে আর কি! দু'গণ্ডা কড়ি গুণে দিলে জনাজাতি চাল-ডাল আর আলু। আর যদি শিবের দোরে গিয়ে উঠলুম, তবে সোনায় সোহাগা! গাছতলাতেই রান্নাবান্না, গাছতলাতেই প'ড়ে থাকা। সে-দেশে কথা কইবো কার সঙ্গে মা? কথা কি বুঝি? মুখ দেখলেই চিনে নেয়, কাশী যাচ্ছি! সবাই পেন্নামি দেয়! পুঁজিপাটা সঙ্গে থাকলে পুঁটলি সামলাতেই দিন যায়,—হারাবার ভয়, বিপদের ভয়, প্রাণের ভয়! তার চেয়ে কিছু নাই বা রইল সঙ্গে! এক মনে কাশী গিয়ে পৌঁছবো, মা! হাড় ক'খানা নিয়ে যদি পৌঁছই, নাই বা ফিরে

এলুম! পথের ধারে একখানা পাথর হয়ে প'ড়ে থাকি, সবাই মাড়িয়ে যাক্।

কিন্তু কাশী পৌঁছতে গুরুমার লাগতো অনেক দিন!

ভ্রমণ হ'ল সেই নতুন জলের জোয়ার, যেটা বদ্ধজলায় ঢুকে জলকে নির্মল করে। চল্‌তি জীবনের মধ্যেই একপ্রকার নবীনতা আনে, ভ্রমণের সেটি মস্ত সার্থকতা। ঘরে ব'সে যিনি ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েন, তিনি ঘরের বাতায়ন খুলে রাখেন,—সেই ঘরে বাহিরের হাওয়া এসে ঢোকে। কিন্তু যিনি ভ্রমণ করেন, তিনি সেই বাতাসে ভেসে যান দূর দূরান্তরে। পাঠক পান মন দিয়ে, ভ্রাম্যমান পান জীবন দিয়ে। ভ্রমণের পরম মূল্য সেইখানে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনকে টেনে নিয়ে যায়,—ভ্রমণ সেই কারণে মানসিক আবিলতাকে ঘোচায়, জরা ব্যাধি আলস্য বার্ধক্য— এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রাণসজীবতার সর্বপ্রধান উপকরণ হ'ল ভ্রমণ।

গুরুমা কেমন ক'রে গিয়েছিলেন প্রয়াগে আর বৃন্দাবনে, কেমন ক'রে গিয়েছিলেন পশুপতিনাথে, চন্দ্রনাথে আরে জগন্নাথে, —সেই সব কাহিনীর আনুপূর্বিক স্মৃতি আর মনে নেই। তারা গেছে গুরুমার সঙ্গে সঙ্গেই। শুধু মনে পড়ে গঙ্গায় তিনি ভাসলেন নৌকায়, আর সেই নৌকায় পাল তুলে দেওয়া হ'ল! সেই নৌকা ভেসে চলেছে কোনো এক গঙ্গায়, মানচিত্রে যাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই গঙ্গার কোনও কূল নেই, আদি অন্ত নেই। পথ তার ফুরোয় না, ঘাটও তার চোখে পড়ে না। দুই পারের অজানা দেশ, তারা যেন চিরকালের অচেনা। সেই অনন্ত গঙ্গার আকুলিবিকুলি জলের নীচে কেউ হয়ত বীজমন্ত্র পাঠ করছে—যেমন বৃদ্ধা গুরুমা ওই নৌকায় ব'সে তাঁর নিমীলিত দৃষ্টি নিয়ে, তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন!

আমারও মন অনেকবার ভেসে গিয়েছে ওই নৌকার পিছনে পিছনে। লগি ঠেলেছি, দাঁড় টেনেছি, হাল ধরেছি, পাল তুলেছি। আবার ওই সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা এঘাট ওঘাট ঘুরেছি। ভাটপাড়ার ওই বৃদ্ধার পেশা ছিল শিষ্যের কানে কানে ইষ্টমন্ত্র দিয়ে যাওয়া। বৃদ্ধা কোনোদিন জানতেও পারেন নি, এক ক্ষুদ্র বালক তাঁরই মন্ত্র তুলে নিচ্ছে প্রাণের মধ্যে,—তার সঙ্গে কিছু 'ইষ্ট' থাক আর নাই থাক। ওই গঙ্গায় হয়ত কোনও কালে কূল খুঁজে পেতেন গুরুমা, কিন্তু সেদিনকার সেই ছেলেটা কূলহারা হয়ে অকূলের দিকে ভেসে চ'লে যেতো। সে যাই হোক, ওই বুড়ি কিন্তু সকলের বিস্ময়ের পাত্রী ছিল। তীর্থ যাত্রাপথে দুঃখ পেয়েছে, কত যন্ত্রণা সয়েছে, কত ঝড়ে বাদলে দুর্যোগে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে,—কিন্তু ফিরে এসেছে হাসিমুখে। মুখে একটি দাঁত নেই, গাল-চোয়াল-চিবুকের মাংস পাটে-পাটে ঝুলে পড়েছে,—সেই মুখে শীর্ণ হাসি ও প্রসন্নতা। বুড়ি ন'বছর বয়সে নাকি বিধবা হয়,—রাজা রামমোহন বুঝি তখনও বেঁচে।

বুড়ি বেঁচে নেই, কিন্তু হঠাৎ এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। বেশ মনে পড়ছে, চাইবাসা শহরের সেই যে মস্ত দীঘি, সেটি পেরিয়ে যাবার সময় পাশ ফিরে দেখেছিলুম জলের ভিতর থেকে ডাকছে গুরুমা। ভয় পেয়েছিলুম ভরসন্ধ্যাবেলা। বুড়িকে দেখেছিলুম পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমিতে,—যেখানে রৌদ্রের মধ্যে বেগনী বাষ্পরেখারা উঠছিল। বুড়ি আমার পাশে পাশে গিয়েছিল নাসিক রোড ধ'রে পঞ্চবটির রাস্তায় গোদাবরী তটে। ইন্দোরের অহল্যাবাঈয়ের মন্দিরে তাঁর ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওই বুড়ি যেন কানে কানে বলেছিল—হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!

প্রকৃতপক্ষে বুড়ি আমাকে ছাড়ে নি। এমন হতে পারে আমিও বুড়িকে ত্যাগ করি নি। গুরুমা গল্প করতেন রাত্রির পর

রাত্রি জেগে, কিন্তু সে-ছবি বিবর্ণ হয়ে এসেছে। বুড়ির প্রকৃত ছবি দেখি সে গতিশীল, সে কেবলই হাঁটছে, নব্বই বছর ধ'রে হাঁটছে! শুধু নিজে হাঁটছে না, আর একজনকেও হাঁটাচ্ছে। দেখাচ্ছে নতুন পথ, নতুন জীবন, নতুন ভারত! কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, আসাম থেকে আরব সমুদ্র।

গুরুমার সঙ্গে থাকতো একটি পুঁটলি, সেইটি তাঁর তল্পি। সেই পুঁটলি খুললে অসীম ঔৎসুক্য নিয়ে ভিতরটা দেখতুম। তার মধ্যে গঙ্গামাটির একটা সোঁদা গন্ধ! তার মধ্যে দেখতুম কাড় আর কোন্ নদীর নুড়ি, কামাখ্যার সিঁদুর, গয়ার ছোট্ট পাথর বাটি, হোলকারের মোটা তামার পয়সা, বৃন্দাবনী গামছা, পলার মালা, চন্দনকাঠের চিরুনী, কাগজমোড়া মকরধ্বজ, ছোট্ট ন্যাকড়ার পুঁটলিতে এক মুঠো কোথাকার যেন ভস্ম। আরও অনেক রকম, সব মনে নেই। কিন্তু ওদের মধ্যেই পেতুম বৃহৎ ভারতের পরিচয়, পেতুম অজানা তীর্থপথ, পেতুম দুরাশার ডাক, দুর্গম দেশের স্বাদ বালককালের বিশ্বকল্পনা ওই পুঁটলির মধ্যে থাকতো লুকিয়ে।

বুড়ি বেঁচে নেই, কবে মারা গেছে তাও মনে নেই। কিন্তু যতদিন ছিল ততদিন ওর মধ্যে দেখতুম সেকালের সেই ভূগোলের ভারতবর্ষকে, আজ বোধ হয় সে নেই ব'লেই এই বিশাল ভারতের নানাপথে ওকেই যখন-তখন দেখি।—

পায়ে হেঁটে যিনি দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করেন তাঁকে আমরা বলি পরিব্রাজক। পরিব্রাজকের ধর্মই হোলো পায়ে হেঁটে

বেড়ানো। পথে চলা একটা আনন্দের নেশা, এই নেশার অধিকারী সকলে নয়। আমাদের দেশে কথা আছে, উঠে দাঁড়িয়ে যদি হাঁটতে পারো, তবেই তুমি পথ পাবে—এবং সম্মুখের পথ ধ'রে যখন হেঁটে যাবে, তখন অদৃশ্য শক্তি হবে তোমার সহায়, সেই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলবে। মানুষের জীবনের আরম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত আমরা যদি একবার কল্পনা করি তবে দেখতে পাবো একটা দীর্ঘ পথ। এই পথের ধারে কত জানা-শোনা, কত চেনা-পরিচয়, কত আনন্দ-বেদনা, কত স্নেহ আর ভালবাসা। কিন্তু জীবনের পথটা কোথাও যেন থেমে নেই। নদীর মত সেই পথ চ'লে গেছে এঁকে বেঁকে পাক খেয়ে খেয়ে। সৌরলোকে আমরা দেখতে পাই, গ্রহ উপগ্রহ সব নিজ নিজ কক্ষপক্ষে অক্লান্ত ঘুরে ঘুরে চলেছে। সৃষ্টিলোকে দেখতে পাই বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে ফুল, ফুলের থেকে ফল—অর্থাৎ সেই একই পথ, কোনো ব্যতিক্রম নেই। কালের দিকে চেয়ে দেখো, তারও আছে পথ, আছে গতি! কাল থেকে কালান্তরে, এ-যুগ থেকে ও-যুগে সে পেরিয়ে চলেছে। তারপর সভ্যতার কথা। হাজার হাজার বছর ধ'রে কত সভ্যতা আপন আপন আলো নিভিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে—এ সভ্যতাও একদিন যাবে মুছে, মানুষ নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে করতে আবার যাবে এগিয়ে। যেখানে দেখতে পাই, পথ অবরুদ্ধ, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ, জীবনের যেখানে জড়ত্ব অথবা অসাড়তা এসেছে, সেখানেই অপমৃত্যু দেখা দেয়। কারণ প্রাণের সর্বপ্রধান চিহ্নই হোলো তা'র গতিবেগে, তা'র পথের আনন্দে।

আমাদের দেশে বর্তমান সভ্যতার যখন উন্মাদনা ছিল না, তখন লোকে পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণ করতে বেরুতো। এই দেবভূমি ভারতের নরনারীরা চিরকাল ধ'রে সকল পথকেই

তীর্থপথ ব'লে মেনে এসেছে। পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পরিব্রাজকরা পথের আনন্দে মেতে উঠতো। প্রকৃতপক্ষে পায়ে হাঁটার অভ্যাস আমাদের চিরদিনের। অখণ্ড ভারত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল এদেশের মানুষরা একদিন পায়ে হেঁটে। রামায়ণে আমরা দেখি শ্রীরামচন্দ্র পায়ে হেঁটে চলেছেন দণ্ডকারণ্যে, যুদ্ধযাত্রা করেছেন তিনি পায়ে হেঁটে। মহাভারতেও তাই দেখি। পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন, অর্জ্জুনের প্রবাস ভ্রমণ, পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর স্বর্গারোহণ—সমস্তই হাঁটা পথে। হাঁটা হোলো এদেশে তপস্যার একটি প্রধান অঙ্গ। ভগবান বুদ্ধদেব, সম্রাট অশোক, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য—এবং আরও বহু মহাপুরুষ পায়ে হেঁটে হেঁটে তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন। যীশুখৃষ্টের জীবনেও আমরা দেখি, তিনি একজন মস্ত বড় পরিব্রাজক ছিলেন। কনফুসিয়স ও তাই। চীনদেশ থেকে পুরাকালে এসেছিলেন হুয়েন সান ও ফা হিয়েন—তাঁরা ছিলেন পরিব্রাজক। ছ'শো বছর আগে ভারতে এসেছিলেন মরক্কোবাসী ইবন-বতুতা। তিনি পায়ে হেঁটে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। একশো বছর আগে আমাদের দেশে রেলপথ ছিলনা—তখন এদেশের লোক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতো পায়ে হেঁটে। তখন রেওয়াজ ছিল কোনো পরিচিত নদীর উজান অথবা ভাটির পথ ধ'রে হেঁটে চলা। গঙ্গার পথ ধ'রে আগেকার লোকেরা চিরদিন ধ'রে তীর্থযাত্রা করেছে একথা সকলেই জানে। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার—এরা সবাই নদীর তীরে অবস্থিত, নদীতীর ধ'রে যাত্রা করলেই এদের পাওয়া যায়। আজও রেলপথ হওয়া সত্ত্বেও সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রীদল—কুম্ভমেলা, হরিহরছত্রের মেলা, রথযাত্রার মেলা—ইত্যাদি উৎসবে শত শত ক্রোশ পায়ে হেঁটে যোগদান করে।

পায়ে হেঁটে ভ্রমণে যাওয়া ছেলেমেয়েদের পক্ষে শিক্ষার

একটা প্রধান অঙ্গ। আজকের দিনে যারা উড়ো জাহাজে ভ্রমণে যায়, তাদের চোখের সামনে কেবল থাকে শূন্য। তারা মন দিয়ে কিছু দেখে না, কিছুর সঙ্গেই তাদের পরিচয় হয়না—এবং তাদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ ও একটা মহাশূন্যলোক অতিক্রম করা ছাড়া আর কিছু নয়। মোটরে যারা ভ্রমণ করে, তারা চোখের আনন্দ কিছু পায় বটে—তাদের সামনে দিয়ে পথের দু-ধারের দৃশ্যগুলো দুই পাশ দিয়ে ছুটে যেতে থাকে—এইমাত্র। কোনো বস্তুরই আসল পরিচয় পাওয়াটা হয়ে ওঠে না। রেলপথও তাই। ট্রেণ চললে আমরা কী দেখি? মাঠের পর মাঠ, শস্যক্ষেত, নদী, অরণ্য, পর্বত। স্টেশনের পর স্টেশন, অথবা গ্রামের পর গ্রাম, আর শহরের পর শহর—এর বেশী কিছু নয়। কোনোটাই তাড়াতাড়িতে দেখা হয়ে ওঠে না, কোনোটারই সত্য পরিচয় পাওয়া যায়না। তুমি যদি সমগ্র ভারত ট্রেণে আর মোটরে ভ্রমণ করো—তবে তার স্মৃতি একদিন মন থেকে সহজে মুছে যাবে—কিন্তু কোন্ অজানা নদীর ধারে কোন্ একটি গ্রামের মন্দিরে ব'সে নিরিবিলি বিশ্রাম নিয়েছিলে—তা'র স্মৃতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তোমার মনে থাকে।

আজকের এই নতুন সভ্যতার আগে আমাদের দেশের জীবনযাত্রাটি ছিল অতি মন্থর। কোথাও ব্যস্তভাব ছিল না, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমাদের কাজের ঘোড়া এমন উন্মত্ত হয়ে ছুটতোনা,—অতি মৃদু ও ধীরগতিতে আমরা জীবন যাপন করতাম। সেই কারণে আমাদের ভ্রমণ ও আনাগোনাও কিছু অলস। আমরা যে-জন্তুটিকে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করি, সেটি হলো গরু। প্রথমত তার দুগ্ধে আমরা প্রাণশক্তি পাই, দ্বিতীয়ত সে নিরীহ, তৃতীয়ত তা'র গতি অতি মৃদু, এবং চতুর্থত তা'র সাহায্যে আমরা খাদ্যসম্ভার উৎপন্ন করি। আজকের দিনে গরুর গাড়ীতে দেশভ্রমণ করতে যাওয়া আধুনিক লোকের কাছে হাস্যকর এবং

আপত্তিজনক। কিন্তু গরুর গাড়ীতে যারা যাতায়াত করে—তারা দেশের প্রাণলোকের অতি কাছাকাছি থাকে। তারা দেখতে পায় সব, বুঝতে পারে অনেক কিছু। যে-পথ দিয়ে তারা চলে, সে-পথের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ভালো-মন্দ—সব কিছুর সঙ্গে তাদের প্রাণের পরিচয় ঘটে। সুতরাং গরুর গাড়ীতে ভ্রমণ করাটা নিতান্ত হাস্যকর নয়। কিন্তু পায়ে হাঁটার শিক্ষা সকলের অপেক্ষা বেশী। মানুষ সজাগ ও সতর্ক হয়ে থাকে পায়ে হাঁটা পথে। তার বুদ্ধি বিবেচনা থাকে সচেতন, শরীর থাকে সক্রিয় এবং মনের সংগ্রাহিকা-শক্তি—ইংরেজীতে যাকে বলা চলে receptiveness—সেটি থাকে জাগ্রত। পায়ে হাঁটা মানে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে পথকে অনুভব করা, দুইধারের দৃশ্যকে বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা দিয়ে তা'র স্বরূপকে উপলব্ধি করা। সেই কারণে পায়ে হাঁটা পথে ক্লান্তি আর আলস্য যেমন নিবিড়, আনন্দ আর পরিতৃপ্তিও তেমনি অফুরন্ত। ধরো কতকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একজন লোক ট্রেণে গেল দুঘণ্টায়—সে কতটুকু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলো? কিন্তু যে-লোকটি আটদিন ধ'রে পায়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পৌঁছলো বর্ধমানে সে ত' প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে! কত গ্রাম সে পেরিয়েছে, কত নরনারীর মনের সঙ্গে তা'র পরিচয় ঘটেছে, কত নতুন পথ সে চিনেছে, কত দৃশ্য দেখে তার মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে—এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে তার কত গভীর পরিচয় হ'তে পেরেছে। আজকাল পায়ে হেঁটে ভ্রমণের অভ্যাস উঠে গেছে, সেই কারণে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-সঞ্চয় ঘটে পাঠ্য বই থেকে—অভিজ্ঞতা থেকে নয়। সুতরাং শিক্ষাটা তাদের কাছে হয়ে ওঠে পঙ্গু—সেই শিক্ষার প্রাণশক্তি থাকেনা। পুরাকালে আমাদের এই দেশের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষাগুরুকে সন্ধান করার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তো—জ্ঞানের ক্ষুধা

তাদের ছিল জাগ্রত। পথে পথে দেশবিদেশে পর্বতে অরণ্যে তারা শিক্ষাগুরুকে খুঁজে বেড়াতো, আর তারই ফলে তা'রা পায়ে হাঁটা পথের প্রচুর অভিজ্ঞতা প্রথমেই সঞ্চয় করতো—সেইটিতে হোতো তাদের শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন।

এদেশের দুঃসাধ্য তীর্থপথগুলি যুগে যুগে তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটেই জয় করেছে। দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয় কৈলাস ও মানস-সরোবর, কেদার ও বদরীনাথ, স্বর্গদ্বার ও শতপন্থ, অমরনাথ—এসব তীর্থে মানুষ চিরকাল ধরে পিপীলিকার মতো হেঁটে গেছে। গভীর গহন অরণ্যে, দূর সমুদ্রতীরে, দুস্তর ও দুঃসাধ্য বহু অঞ্চলে—যেখানে আজও কোন যানবাহন পৌঁছতে পারেনা—মানুষ সেখানে হেঁটে গিয়ে বহু কষ্ট ক্লান্তি সানন্দে বরণ করেছে। যারা ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী তারা জানে তীর্থপথটাই বড়—কারণ দীর্ঘ ও দুর্গম পথই তাদের সাধনা—তীর্থ মন্দির তাদের কাছে একান্তভাবে নয়। এদেশের প্রাণের দেবতারা থাকেন তীর্থের পথে পথে।

কেবল এদেশে নয়। দুঃসাধ্য পথে হেঁটে যাওয়ার ক্ষুধা সকল দেশের মানুষেরই সহজাত। ভীষণ ও নির্জন মেরুপথে গেছে মানুষ, আফ্রিকা ও ব্রেজিলের অগম্য অরণ্যে তারা পা বাড়িয়েছে, মধ্য এশিয়ার সহস্র সহস্র মাইল মরুভূমি তারা হেঁটে পার হয়েছে, তিব্বতের দুর্গম তুষারলোকে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তারা পায়ে চলা পথ হারায়নি। অনাবিষ্কৃত ভূভাগ আবিষ্কার করেছে মানুষ পায়ে হেঁটে, দুরারোহ পর্বত পায়ে হেঁটে পেরিয়ে মানুষ তার উপরে নিয়ে গেছে রেলপথ, অরণ্যকে দুই পায়ে জয় করে নগরের সৃষ্টি হয়েছে। গোবি ও সাহারা মরুভূমি, যার ও তাব্‌লামাকান মরুভূমি, নদী ও সাগর-সঙ্গমের অগম্য মোহনা, নরখাদকের রাজ্য, উত্তর সাইবেরিয়ার তুহিন পথ—এদেরও মানুষ পায়ে হেঁটে জয় করেছে। কোথাও বাধা মানেনি,

মানুষের পা কোথাও ক্লান্ত হয়নি, পরিব্রাজক কোনো পথের মাঝখানে পরাজয় স্বীকার করেনি। তারা গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে দেশে, দেশ থেকে মহাদেশে, তারপর সারা পৃথিবীময় পদচারণা ক'রে চলেছে। মানুষেয় চোখের সামনে নিকট থেকে দূর, দূর থেকে দূরান্তর—পায়ে হাঁটা পথ কোনোদিন ফুরোবে না। পথই চিরদিন তাদের পথ ভুলিয়ে দিয়ে গেছে—সেই পথের আরম্ভ আর শেষ কোনোদিন কোথাও নেই। মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা ও স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ পথই হোলো অবাধে পায়ে হেঁটে চলার পথ।

পলায়ন—আমার এক বন্ধুর বইয়ের নাম।

চারিটি বিভিন্ন অক্ষর, কিন্তু একত্র সম্মিলিত হয়ে ওর যে বিশ্বব্যাপী অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, হৃদয়কে ছোট করলে তাকে অনুভব করা কঠিন। পলাতক হ'লে ব্যক্তির সংজ্ঞা আসতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি—পলায়ন হলো বিস্তৃত জীবনের পটভূমি; সব কাজের শেষে পলায়ন, সকল পরিণামের সর্বশেষ ব্যাখ্যা হলো পলায়ন। পলায়নের পাশেই আছে নির্লেপ, সেই কারণে পলায়ন স্বাস্থ্যকর—সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে—অস্বীকার ক'রে পালানো! দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়ানো, সত্যের চেহারাকে নির্ভুল বিশ্লেষণ করা। যে জীবন দাঁড়িয়ে উঠেছে সংশয় আর নৈরাশ্যে, যা ভিত্তিতে দুঃখবাদ, যার পরিচালনায় দুর্ভোগ,—সেই জীবনকে নির্দয় নির্লিপ্ততায় বিচার ক'রে চলা,—তাকেই পলায়ন বলতে

পারি। বইখানা খুলে দেখি ওর মধ্যে আর যাই থাক, ঘর ছেড়ে পালানো কিংবা কলেজ ভেঙে পালানো নেই। দেখে খুশি হলুম।

পালাবার সাধ কারো কম নয়। কেরানির বউ যেমন সব কাজের শেষে পালায় ছাদে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও পালান্ উইক এণ্ডে। যে সব স্বামীজিরা আমাদের কর্মজীবন সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাঁরা এক একটি উঁচুদরের পলাতক। কারণ, ভগবানকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়া একটা প্রকাণ্ড পলায়ন। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। আমার চারিদিকে যা আছে তাই নিয়ে আমি খুশি নই, সুখী নই। এদের ফাঁস কাটিয়ে আরও কিছুর জন্যে আমি বেরিয়ে পড়ি। নরওয়ের সাহিত্যে একটা গল্প আছে,—নায়ক বহুধা বিভক্ত হতে চাইছে। একই মানুষ বহুরূপে প্রকাশ করছে নিজেকে। কখনো ভবঘুরে, কখনো ভিন্‌দেশী, কখনো দর্জি, কখনো ছদ্মদেশী সমাজসেবক। তার সুখ নেই, স্বস্তি নেই। যেটা গ্রহণীয় সেটাতেই তার বিরক্তি। অর্থাৎ, হাতে যা আসছে তাই সে নেড়ে চেড়ে ফেলে দেয়। আবদার ধ'রে বসে, এটা নেবো না, ওটা নেবো। কত খেল্‌না আছে সংসারে কিন্তু তার মন ভোলানো গেল না। সে একটার থেকে আর একটায় টপকে যেতে চায়, পালাতে চায় জানা থেকে অজানায়। পলায়ন তার মজ্জাগত। সে এক, কিন্তু সে বহু।

আমি ত দেখি বিপুল পলায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি কেবল স্থির ধ্রুব। পৃথিবী বারে বারে পালাচ্ছে সূর্যকে ছেড়ে, চন্দ্র বারে বারে পালায় পৃথিবীকে ছেড়ে। জল পালিয়ে যায় মেঘ-লোকে, মানুষ পালায় দেহ অতিক্রম করে। আর পশুপক্ষী? এরা ত নিরন্তর ছুটছে,—কোথাও থেমে নেই। বীজের ভিতর প্রাণকোষ অস্থির, গর্ভের ভিতরকার শিশু মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল। চোখ চেয়ে দেখি বিশ্বপ্রকৃতির চোখে পলক পড়ে না, পর্দা উলটিয়ে দেখি, পালাবার জন্য তার অস্থির

ব্যস্ততা। পাহাড়কে দেখছি স্থাণু চিরকাল, কিন্তু দুরন্ত প্রাণধারায় সে উদ্দাম।

প্রাণ এবং পলায়ন—এই দুইয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আশ্বিনের নতুন চক্‌চকে আকাশ বেতারযোগে প্রাণকে খবর পাঠালো, পালাও। অমনি কন্‌সেসন টিকিটে ছুটলো চাকুরের দল, ছুটলো ট্রেন, ছুটলো মন। গয়া, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী। শৃঙ্খল ছিঁড়ে পাখীর দল পালালো অজানায়। শরীর সারাতে নয়, মন সারাতে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চললো একটা থেকে আর একটায়; যেখানেই যায় সেখান থেকেই পালায়। অবিরাম, অশ্রান্ত ঔৎসুক্য। এর নাম পলায়ন।

ঠিক মনে নেই, বোধহয় হর্দৈ স্টেশন। পৌষের গভীর রাত। ওয়েটিং রুমে ঘুমোচ্ছিলাম। যুক্ত প্রদেশের উত্তর ভাগের শীতে আড়ষ্ট শরীর। একখানা ট্রেন এসে থামতেই সহসা নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ এলো। প্লাটফরমে বেরিয়ে এলাম। রাত্রির জনবিরল স্টেশন। দেখি, তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় একটি বর্ষীয়সী স্থূলকায়া স্ত্রীলোক ওলোট পালট খেয়ে গগন-বিদারী চীৎকার তুলেছে, আর একটি স্ত্রীলোক নীরবে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দুজনেই দক্ষিণী, হরিদ্বারের ফেরৎ। খবর নিয়ে জানা গেল, আগের কোন্ এক স্টেশনে তার ছেলেটি গাড়ী থেকে নেমেছিল কৌতূহলে, কিন্তু আর ওঠেনি। বিস্ময়ের কথা এই, যে চীৎকার করছে, ছেলেটি তার সন্তান নয়; যে সান্ত্বনা দিচ্ছে সেই স্ত্রীলোকটিই পলাতকের জননী। কিন্তু প্রশ্ন হোলো, ছেলেটি গেল কোথায়? সে নেমেছিল গাড়ী ছেড়ে, আর ওঠেনি। অজানা দেশের অন্ধকারে কোন্ ঔৎসুক্য তাকে আকর্ষণ করেছে? শীত গ্রাহ্য করেনি, শৃঙ্খল মানেনি, ট্রেনের নিয়মতন্ত্রকে সে অস্বীকার করেছে—তার মন

ছুটে গেছে পলায়নে। পলায়ন শব্দটা পুরুষের রক্তপ্রবাহে ভেসে বেড়ায়।

অসামাজিক মনোবৃত্তি তোমার আমার ওদের তাদের সকলের মজ্জাগত। অনেক কাল লোকসমাজে বাস ক'রে ক'রে তুমি ক্লান্ত, তুমি চাইলে স্বস্তি, তুমি চাইলে তোমার সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে কিছুকালের মুক্তি নিয়ে পালাতে। তুমি গেলে কোনো নির্জন পাহাড়ের অধিক্যতায়, কোনো খরবাহিনী নির্ঝরিণী তীরে, আমি গেলুম বেণুবনচ্ছায়াময় নিভৃত পল্লীর ধারে। মজ্জাগত অসামাজিক আমাদের মন। লোকনিন্দার শাসনে আর লোকচক্ষুর লজ্জায় আমরা নিয়মশৃঙ্খলাকে মানি, কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রকাশ করি সেই আদিম স্বাধীন বৃত্তিকে। মানুষ আসলে জন্তু, বুদ্ধিমানদের কড়া শাসনের আবেষ্টনে সে বাঁধা—এই মাত্র। ধরো, একটা বিপ্লব দেখা গেল। দেশে পুলিশ নেই, সামরিক শক্তি নেই। জনতা যখন জানলো অন্যায় করলেও তার শাস্তি নেই, সে তখন খোলস খুলে ফেললো। অবচেতন চিত্তের যত অবরুদ্ধ বাসনা অনুকূল অবস্থায় শৃঙ্খল খুলে বেড়িয়ে পড়লো। খাঁচার তলা ভাঙলে জন্তু জানোয়ার যেমন বেপরোয়া সবাইকে আক্রমণ করে। দেশময় চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, বলাৎকার—লোভ, ক্রোধ, হিংসা—প্রভৃতি আদিম বৃত্তির ভয়াবহ চণ্ডলীলা চললো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এর ওপর ঝোঁক নেই, এমন মানুষ কম। শিক্ষা আর সংস্কৃতির গুণে এই আদিম বৃত্তিকে কেউ সংযত করে, কেউ বা ভদ্র পোষাক পরিয়ে বা'র করে। দস্যুর হাতে এক নারী লাঞ্ছিত হ'লে তাকে আমরা বলি ইতরবৃত্তি, কিন্তু শিক্ষিত যুবক যখন লোভে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, মাৎসর্যে একটি মেয়েকে উৎপীড়ন করে, আকর্ষণ করে, তখন আমরা তার অন্য নাম দিই। দস্যুর হাতে লাঞ্ছনা সাময়িক কিন্তু শিক্ষিত যুবকের হাতে লাঞ্ছনা যে অনির্দিষ্ট কাল অবধি চলে এবং নারীকে নির্যাতিত

করে, প্রতারণা করে, নারীহৃদয়ের রক্তশোষণ করে একথা আমরা সুবিধামতো মনে রাখিনে।

কথায় কথা বাড়ে। সেদিন সংবাদপত্রের একটি খবরের কথা বলি। বিলাতের কোনো এক কারখানায় একটি ছেলে কাজ করতো। তার একটি প্রণয়িনী ছিল। ছেলেটির মনে ছিল মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে আদিম সন্দেহ। সুতরাং কারখানায় যাবার আগে সে মেয়েটিকে লোহার শিকলে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রেখে যেতো। শারীরিক যন্ত্রণায় মেয়েটি ব'সে ব'সে কাঁদতো নীরবে পুলিশ খবর পেয়ে এসে হাজির। তারা লোহার শিকল কেটে দিয়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলো, তোমার ওপর এত অত্যাচার করে, তুমি ওকে ছেড়ে যাওনা কেন ?

মেয়েটি চোখ মুছে বললে, কিছুতেই পালাতে পারিনে, জন আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে।

অর্থাৎ দেহের উৎপীড়নকে সে মানে না, ভালোবাসার মধ্যেই সে পায় স্বচ্ছন্দ জীবন, সেখানে তার মুক্তি, সেখানেই স্বাধীনতা —পালাবার দরকার তার নেই। বাঁধনকে তখনই বাঁধন ব'লে মনে হয় না, যতক্ষণ প্রাণের মধ্যে থাকে স্বচ্ছন্দ আনন্দ। আমাদের সমাজে শাসন আছে, সন্দেহ আছে, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উৎপীড়ন আছে,—কিন্তু মমত্ববোধ নেই। বর্তমান জীবন তার প্রসার খুঁজতে চাইছে, ব্যাপ্তির মধ্যে সে চাইছে বিস্তৃত স্বাধীনতা, কিন্তু তার পথ নেই। কোথাও কোনো অন্যায় ঘটেছে, কোনো সম্ভ্রান্ত নারীর সতীত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে, জননীত্ব গোপন করার জন্য কোনো নারীর অপমৃত্যু ঘটেছে,—অমনি আর রক্ষা নেই। বড় বড় হরপে সেই তথাকথিত দুর্নীতির খবর ছেপে দরজায় দরজায় হাতে হাতে বিক্রি। এমন নির্লজ্জ কলঙ্ক-বিক্রয় কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব।

জানি এর উল্‌টো কথাটাও আছে। নারীধর্মের উপর সমাজ-

জীবনের ভিত্তি,—অবিবাহিতার জননী হবার অধিকার আজো সভ্যজগতের সমাজপতিরা স্বীকার করেনি। সমাজ এক বস্তু, চিত্ত রহস্য ভিন্ন বস্তু। একটা অন্যটার প্রতিবাদ। পৃথিবীতে যাঁরা বরেণ্য তাঁদের সকলেই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু অনেকেই চরিত্র শুচিতার পরিচয় দেননি। প্রতিভা দৈব, স্বভাব ধর্ম মানবিক। একটি মেয়ের নৈতিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হ'লেও প্রতিভার পরিচয় সে দিতে পারে। পৃথিবীতে এমন বহু মেয়ে পাওয়া গেছে যাঁরা তথাকথিক সতীত্বকে মানেননি, কিন্তু শিক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, চারুকলায় এবং নৃত্যগীতে তাঁরা অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষের কথাও তাই। পুরুষ স্রষ্টা, পুরুষ নিত্য পৃথিবীকে সৃষ্টি ক'রে চলেছে, প্রত্যেকটি পুরুষের মধ্যে রয়েছে রক্তগত সৃজনপ্রতিভা,—নৈতিক চরিত্র তার কাছে প্রধান কথা নয়। পুরুষের আলোচনায় প্রতিভার কথাই ওঠে, নৈতিক চরিত্রের আলোচনা তার কাছে হাস্যকর, ওটায় সে বিরক্তি বোধ করে।

কিন্তু পলায়ন কা'কে বল্‌বো?

কলেজ-পালিয়ে ছাত্ররা যায় বনভোজনে, কেরানি আপিস পালায়, তরুণী ঘর ছেড়ে পালায় যুবকের কোঁচার খুঁট ধরে, রাষ্ট্রবিপ্লবে জনসাধারণ পালায় রাজধানী ছেড়ে, দরিদ্র আত্মহত্যা ক'রে দারিদ্র্য থেকে পালায়, কয়েদী পালায় জেল থেকে, বাপের শাসন থেকে ছেলে পালায়, স্ত্রীর উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নিয়ে পালায় নির্বোধ স্বামী। কিন্তু পলায়ন কোন্‌টা?

মুসৌরী পাহাড় পেরিয়ে কেম্‌টি জলপ্রপাতের পথে নিজের মনে চলেছি। হেমন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ আর মেঘ ঝলমল করছে। দূরে 'ক্যামেল্‌স্ ব্যাক্' ধীরে ধীরে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। উত্তর দিকে দিগন্ত সীমানায় চিরতুষার শুভ্র

হিমালয়-কীরিট। এদিকে ম্যালের পথ কেম্‌টির বাঁকে এসে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

অন্তর্নিহিত মুক্তির আর স্বাধীনতার পিপাসা না থাকলে ভ্রমণ সিদ্ধ নয়; নিজের দুই পায়ে চলার পথটুকু অতি সংকীর্ণ সবাই জানে, কিন্তু আমার সেই পদচিহ্ন পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে কুটুম্বিতা না করলে পর্যটন সার্থক নয়। তাই ভ্রমণের অপর নাম দিলুম পলায়ন। যা কোনোকালে জানতে পারিনি, আমার বোধের মধ্যে যার চেতনা নেই, চিরকাল ধ'রে দুর্জ্ঞেয় আর দুর্গম—তার পিছু পিছু ছুটে চলাকে কি বলবো? ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা পথে-বিপথে বেড়িয়ে পড়ে, যে সিদ্ধার্থ পালায় নিদ্রিতা প্রিয়তমার শয্যা ছেড়ে অন্ধকার রাত্রে, জনজীবনের কল্যাণে যে-টলষ্টয় পথে বেরিয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হবার আনন্দে, যে-দুঃসাহসী অভিযান করে দক্ষিণ মেরুপথে, শ্রাবনের দুর্যোগে যে চিররাধিকা চিরঘনশ্যামের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করে, তাকে কি বলবো?

অসন্তোষ আর জিজ্ঞাসা, পলায়নের মূলমন্ত্র। অল্পে সুখ নেই বহু বিদ্যায় তৃপ্তি নেই,--এমন মানুষ যখন বেড়িয়ে পড়ে বড় কিছুর জন্যে, মহৎ কিছুর আশায়, তখন বুঝতে পারি মানুষের মানে। অসাধারণ তার প্রতিভা যে পালাতে জানে; অসামান্য তার শক্তি, যে হারাতে জানে।

মুসৌরী পেরিয়ে কেম্‌টির পথে যেতে যেতে এই কথাই ভাবছিলুম।

বিদেশে যাত্রীর বাসাকে কেন যে ধর্মশালা বলে, আমি কোনদিন খোঁজ করিনি। কিন্তু ধর্মশালার প্রতি আমার নিগূঢ় দুর্বোধ্য আকর্ষণ বার বার অনুভব করেছি।

মুসাফিরখানা, অনেকে বলে। কেউ বলে, যাত্রীশালা। কেউ, যাত্রীনিবাস। কিন্তু ধর্মশালা বললে আমার মনে ছবি ফোটে। রেলপথ পেরিয়ে অজানা কোনও দেশে উত্তীর্ণ হলুম, জ্ঞানের সীমানার বাইরে সেখানকার জীবনযাত্রা, প্রকাণ্ড অপরিচয় পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে, তারই ভিতর দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল এক ধর্মশালা। পরিচিত পুরনো বন্ধুর মতো নিরাপদ তার চেহারা। দুই হাত সস্নেহে প্রসারিত করে ডেকে নিল। সেখানে অসুবিধা হোক, অভাব থাকুক, কিন্তু নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে মনের স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অচেনা দেশের হৃদয়টির সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন হয় না।

বিদেশের হোটেল আমার পছন্দ নয়। আসবাব পত্রে সাজানো ঘর, ঘরের সংলগ্ন বাথরুম, এপাশে ছোট ড্রয়িং, সামনে লন্, বারান্দায় বেতের আরাম চেয়ার, ওয়েটরের আনা কাঁচের প্লেটে উৎকৃষ্ট হিন্দু মুসনমানী ভোজ্য,—এমনিতরো হোটেলী মনোবৃত্তি আমার প্রিয় নয়। নাগরিক জীবন পেরিয়ে এলুম, অথচ নগরের প্রেত থাকবে পিছনে পিছনে,—এই অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে ধর্মশালা অন্তত কিছুকালের জন্য আমাদের মুক্তি দেয়। ভ্রমণে বেরোবাব সময় সব পিছনে ফেলে যাবো। যাদের নিয়ে আমরা প্রত্যহ অভ্যস্ত, যে সব উপকরণ সংযোগে নাগরিক জীবন পরিকীর্ণ, ভ্রমণে বেরোবার সময় তারা যদি খোলসের মত খসে না যায়, তবে আমাদের মন অজানা দেশে গিয়ে কোন অভিনবত্বের আস্বাদ পায় না। সঙ্গে কিছু নেবো না; যা পরিচিত যা সংগৃহীত, যা আমাদের দৈনিক অভ্যাসাবলীর সঙ্গে জড়ানো তারা পিছনে পড়ে থাক্, আজকে সব ছেড়ে যাবার সময় তাদের

কোনো আবদার শুনবো না। অনেকদিন ঘর করেছি যাদের নিয়ে, আমাকে স্থানু মনে করে যারা আমাকে ঘিরে জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছিল, তারা থাক্ ঘরের জঞ্জালের সঙ্গে জমায়েত হয়ে, আমাকে আজ ঐ শরতের সোনার রৌদ্রে হাওয়ার পথ ধরে অজানার দিকে চলে যেতে হবে। আমার আজকে ডাক এলো নতুন ঈশ্বরের দেশ থেকে।

অনেক হাওয়া-বদলের যাত্রীকে আমি দেখেছি। তারা ট্রেনে উঠেই তাস খেলতে বসে যায়। সঙ্গে তাদের বিপুল পরিমাণ বোঁচকা বুঁচকি। কত বিছানা, কত কাপড় চোপড়, কত রকমের বাসনপত্র। কড়া-খুন্তি থালা গেলাস আর টিফিন্-ক্যারিয়রের জটলা, দুধের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক, চামড়া বাঁধা ক্যামেরা, পানের সরঞ্জাম, বিস্কুটের টিন, জেলীর শিশি, সিগারেটের বাক্স। কেউবা নিয়ে চলেছে হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, লুডো ও পাশা, দাবা আর ক্যারম্। এ ছাড়া বাল্‌তি, হারিকেন, লণ্ঠন, চট, দড়ি, লাঠি, সড়কি, বঁটি, ছুরি—এবং আরো কত কি। তারা ঘর ছেড়েছে, ঘরকন্না তাদের ছাড়েনি। সঙ্গে আসবাবগুলোও চলেছে ভ্রমণে। কেউ পকেট-বই খুলে কত ঠিকানা মিলিয়ে নিচ্ছে, যাতে বিদেশে গিয়ে খুঁজে বার করতে কোন অসুবিধা না হয়। কেউ অতিরঞ্জিত বর্ণনায় বিদেশের নিন্দা করে চলেছে; কেউ টাইম টেবল খুলে সেখানকার পথ ঘাটের প্ল্যান্ মুখস্থ করছে! চতুর, সতর্ক, সন্দেহাকুল দৃষ্টি তাদের। তারা হাওয়া বদল করতে চলেছে। তাদের ধারণা পৃথিবীতে সবাই চোর, পৃথিবীর সর্বত্র দুর্গম, বিদেশ মাত্রই দুর্ভিক্ষের দেশ, এবং তারা যেখানে চলেছে সেখানে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। প্রতিবাদ করার উপায় নেই, কারণ, তাদের কাছে পরামর্শদাতা মানেই ফন্দীবাজ; মিষ্ট ব্যবহার করার সাহস নেই, কারণ, ওর মধ্যে তারা অসাধুতার সম্ভাবনা লক্ষ্য করে জিনিসপত্র সামলাতে

থাকে। ওরা হাওয়া বদলের কন্‌সেসনের যাত্রী। ওরা ভয়ানক জীব। তুমি যদি বসতে না পাও, সারারাত্রি যদি দাঁড়িয়ে থাকো, ওরা গ্রাহ্য করবে না। বেঞ্চের ওপরেই ওরা পা তুলে বসে পাশে পোঁট্‌লা পুঁটলি ছড়িয়ে রেখে কাৎ হয়ে থাকবে—যাতে রাত্রের দিকে নিজেদের ঘুমোবার জায়গা পাওয়া সহজ হয়। তুমি যখন আগে ভাগে আসতে পারোনি, তখন তোমার এই শাস্তি! তুমি ঠিক সময়ে এসে ট্রেন ধরেছো, সেই অপরাধে সীট পাবার জুয়াখেলায় তুমি পরাজিত। ওরা বেঞ্চি জুড়ে থাকুক, পিঠের আর ঘাড়ের তলায় পোঁটলা রেখে পা ছড়িয়ে বসুক, ওদের মহিলাটি ও শিশুটির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দুখানা বেঞ্চি দখল করে মালপত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে ওরা পাহারা দিয়ে চলুক আর তুমি থাকো দাঁড়িয়ে বোকার মতো, উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী অকিঞ্চনের মতো। এতটুকু অধিকার অথবা দাবি প্রকাশ করতে গেলে ওরা তাকাবে তীব্র দৃষ্টিতে পুরনো শত্রুর মতো। ওদের হাসি মস্করা, জল খাবার খাওয়া, সিগারেটের ছাইফেলা, তোমার গায়ে জলের ছিটা দেওয়া, ওদের গান, ওদের মাই-ডিয়ারিপনা, সবই তোমাকে ঔদাসীন্যের সঙ্গে সহ্য করতে হবে। কারণ ওরা হাওয়া বদলের যাত্রী, ওরা রেল কোম্পানীর অভিভাবক, অন্নদাতা,—ওদের কৃপা না থাকলে রেলপথ উচ্ছন্নে যাবে।

আনন্দের কথা এই, ওরা ভ্রমণে যায়না, যায় হাওয়া বদলাতে। ওদের স্বাস্থ্য হয়ত ফেরে, সৌন্দর্য বাড়েনা। হাওয়া বদল হয় বটে, কিন্তু হাওয়া ঢোকেনা মনে। ওরা বিদেশ দেখতে যায়না, বিদেশ ওদের দেখে অবাক হয়ে থাকে। ওরা ওদের বিরাট মালপত্রের পাহারাদার হয়ে কেবল ঘুরে আসে, দেখে আসে না। দেখতে যায়না, দেখাতে যায়। ভ্রমণের অর্থ ওদের কাছে নেই।

এই সব হাওয়া বদলের যাত্রীরা হোটেলে গিয়ে ওঠে। ওদের আয়ু অল্প, তাই স্থায়ী বাসার দিকে ওদের ঝোঁক নেই।

বিদেশের প্রসন্ন নিরিবিলি বাতাসকে ওরা বিষিয়ে তোলে উন্নাসিক আত্মাভিমানে। ওদের আহার বিহার নিদ্রা আমোদ আর কৌতুকের দৌরাত্ম্যে বিদেশীদের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওরা দেশ ছেড়েছে, দেশীয়তা ত্যাগ করেনি।

মানুষের আরামের দরকার আছে মানি, আরামকে ভোগ করার মতো দুর্লভ প্রসারতা মনের পক্ষে দরকার তাও মানি। কিন্তু অভ্যাস আর দৈনন্দিনতাকে পিছনে ফেলে যাবার যে দুঃসাহস, সে বস্তু সকলের নেই। যাদের আছে সেই অসমসাহসিকতা, আমি তাদের অনুরাগী। হাওয়া বদলের যাত্রীরা হোটেলে গিয়ে ওঠে, তার কারণ, আরাম আর সম্ভোগের বাইরে জীবনের বাস্তব চেহারাটা তাদের কাছে অপরিচিত, অপরিচিত মানেই আতঙ্ক। ঘর ফেলে যায় তারা পিছনে বটে, কিন্তু ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য বাইরে গিয়ে না পেলে ঘরের বেদনায় তাদের মন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, তারা ফিরে পালিয়ে আসে। সুতরাং বিদেশে যদি গিয়ে থাকতেই হয় তবে হোটেল ছাড়া আর আশ্রয় কোথায়? সেখানে পয়সা দিলে ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু পিছনে যে একজন সব ফেলে গেছে, তার কোনো দুর্ভাবনা নেই। তার ভ্রমণের গতি অবারিত, তার চোখ খোলা, মন ভোলা—অভ্যাসের বাঁধন তার নেই। সে বেরিয়েছে ভ্রমণে, উপকরণের দাসত্ব করতে নয়। আমাকে সংগ্রহ করতে হবে, সুতরাং অন্য হাতে ফেলে ফেলে যাবো। আশ্রয়ের অভাব কোথাও নেই, পথে পথে আছে আছে ধর্মশালা। সহজে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, ভাসতে ভাসতে চলে যাওয়া। ভ্রমণে মুক্তির স্বাদ, অন্তর বাহির মুক্তিতে উজ্জ্বল। গৃহস্থালীর সঙ্গে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। চোখ দুটো স্থূল স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিবদ্ধ নয়, সেজন্য বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়ে সহজে। সংস্কারগত

দৃষ্টি দিয়ে দ্রষ্টব্যকে বিচার করিনে, তারা প্রকৃত চেহারা নিয়ে একেকটি আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই ভ্রমণের একমাত্র সহচর হোলো ধর্মশালা। ভ্রমণের সঙ্গে এর যোগ নিগূঢ়। কত প্রাণ, কত জীবন, কত ভ্রমণ—এই ধর্মশালায় এসে মিশেছে। কারো ইতিহাস, কারো অবিশ্বাস—এর পাথরের স্তরকে। জীর্ণ দেওয়ালগুলিতে কাঠকয়লায় আঁকা কত নাম, কত ব্যক্তির কত পরিচয়, কত জাতির একত্র সমাবেশ। ধর্মশালায় কোথাও আগল নেই, আব্রু নেই, আরাম নেই। ঝড়ে বৃষ্টিতে হিমে রৌদ্রে সে অনর্গল, অবারিত। অনাশ্রিতের পথের দিকে সে অক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তার কোনো দাবী নেই, পাওনা নেই, দেনা নেই, সে দেউলিয়া। বোবা দুর্বোধ্য তার দেওয়ালগুলি, সেই দেওয়াল ফুটে যেন বেরোয় শত সহস্র উদ্ভট প্রশ্ন, অর্থহীন অনাবশ্যক প্রাণ পেতে দিয়ে তার সেই নিঃশব্দ কলরব শুনলে গা ছমছম করে।

কত পথ ঘুরে ফিরে রাত্রে এসে বাসা নিয়েছি ধর্মশালায়। একটি যাত্রী এসে উঠেছিল বিকালের দিকে, সন্ধ্যার আগেই সে চলে গেছে। এত বড় প্রাচীন ইমারত একা নির্জন। আমি একটি টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে বসে আছি।

দেওয়াল আর কড়িকাঠের ফাটলে চামচিকা আর বাদুড়ের পাখার ঝাপট শুনতে পাচ্ছি। পুরানো কাঠে কীটের অবিশ্রান্ত কুরকুর করে খাওয়া। সাপ বেরোয় মাঝে মাঝে। আলো দেখে এগিয়ে আসে লেজতোলা ধূসরবর্ণ কাঁকড়াবিছা। রাত্রির একটা বিশেষ প্রহরে একটি কালো বিড়াল উজ্জ্বল দৃষ্টি ফেলে ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়ায়—এক সময় তার ডাক আর শোনা যায় না। পরিশ্রান্ত একটা কুকুর এক একদিন এসে আশ্রয় নেয়। কোনদিন মধ্যাহ্নের দিকে আসে পথশ্রান্ত কোনো সন্ন্যাসী, কোনোদিন বা একটা পাগলা। কিন্তু রাত্রের দিকে মানুষ আসে

না, আসে অন্য প্রাণী। অন্ধকার কক্ষে, বাড়ীর আনাচে কানাচে, দরজার চৌকাঠের বাইরে কেমন করে এক প্রকার আকস্মিক আওয়াজ শোনা যায়—যা অবাস্তব যার ব্যাখ্যা নেই। মানুষের আওয়াজ নয় জানি, বাতাসের দমকে জান্‌লা দরজার খুটখাট নয় তাও জানি। কেন জানিনে মনে হয়, এছাড়া হয়ত অন্য কিছু। সহসা অন্ধকারে বাস্তবিকতার অস্তিত্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এই ধর্মশালা যেন অবাস্তব একটি প্রেতরূপ ধরে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

শুনেছি আগেকার কালে ধর্মশালা ছিল তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়, এ ছিল তাদের ধর্মপথের সাক্ষ্যস্বরূপ। যারা এই প্রাসাদের মালিক, তাদের কাছ থেকে পাওয়া যেতো আহার ও সাহায্য। মালিকরা সেকালে অকুণ্ঠভাবে অর্থ ব্যয় করতেন। অপরের প্রতি এই বিবেচনা এবং নিঃস্বার্থ ভাবে জনসাধারণের সেবার এই পুণ্যকাজ এই সব যাত্রী নিবাসে হতো, সেই কারণেই নাকি এর নাম দেওয়া হয়েছিল ধর্মশালা।

কিন্তু আমার ধর্মশালায় সেই অতীত সেবা আর পুণ্যের চিহ্ন না থাকুক আছে দুরাশার দাগ এর দেওয়ালে দেওয়ালে, আছে পথের স্বপ্নের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশের সঙ্কেত এর কোণে কোণে, আছে চিরবিস্ময়ের ইতিহাস এর অতীতের সমস্ত বাতাস ভরে।

ধর্মশালা আমার নিজস্ব, আমরা অভিন্ন হৃদয়।

মধ্য ভারতের পথ দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে। কতক্ষণ আগে গাড়ী একবার থেমেছিল, কিন্তু কখন্ থেকে আবার চলতে আরম্ভ করেছে সেদিকে লক্ষ্য করিনি।

সময় ও দূরত্বের ব্যবধান মনের একটা বিশেষ অবস্থা, আমাদের বাহ্য চেতনায় ওর অস্তিত্ব—এই কথা শুনে এসেছি। কিন্তু ট্রেনের চাকার নীচে যে লৌহ চক্রান্তের সংঘাত চলছে, তা'র আওয়াজটা প্রত্যক্ষ, অতি বাস্তব। সেই অতি-ঝঞ্ঝনা-ক্ষুব্ধ আর্তরব শুনতে শুনতে আচ্ছন্নের মতো ব'সে ছিলাম। গাড়ী দ্রুতগতিতে চলেছে মধ্য-ভারতের এক জলাশস্যহীন প্রান্তরের পথ বেয়ে।

অক্‌টোবরের মধ্যাহ্নকাল। আমাদের বাঙলা দেশে এখন শেফালী, কাশ আর শিশিরের সমারোহ। এদিকেও কাশের সম্ভার চোখে পড়ছে, আর দেখতে পাচ্ছি নীলকান্ত আকাশ, আর নিচে-শ্বেতহংসদলের মতো মেঘ। সকালের দিকে এরই মধ্যে এখানকার বাতাসে সামান্য কুয়াশার আমেজ লক্ষ্য করা যায়, যেন মরুচারিণীর আয়ত দুই চোখে কিছু বাষ্পাচ্ছন্নতা। পথের দুদিকে নামহারা লতায় ছোট ছোট বনফুল, কোথাও কোথাও বিগত বর্ষার চিহ্নস্বরূপ ছোট ছোট শালুকভরা সরোবর, আবার কোথাও বা প্রাচীন ভারতের প্রতীক্‌স্বরূপ জরামৃত্যুহীন অশ্বত্থ,—তা'র কপাল থেকে নেমেছে ঝুরি, যেন মুনিঋষির জটা,—আর সেই ঝুরি ছায়া মেলে নেমে এসেছে হয়ত কোন জলাশয়ের কোলে। ট্রেনের জানলার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ছে অদূরবর্তী ছোট ছোট গ্রামগুলির উপরে শরৎকালের আলোছায়ার খেলা; দূরের পরিপ্রেক্ষণে দেখলে প্রকৃতির এই খেয়ালের খেলা বিস্ময় ও আনন্দ জাগায়। পদ্মা আর শোননদীর উপরে এই আলো-ছায়ার খেলা দেখেছি। হয়ত নদীর একাংশে ঘনঘোর বৃষ্টিধারা নেমেছে, আর অন্য অংশে নৌকাযাত্রীরা প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত।

নদীতীরে দাঁড়িয়ে একমাইল থেকে দু'মাইলের মধ্যে এই দৃশ্য ভারি কৌতুকপ্রদ। মানুষের প্রকৃতিতেও এই আলোছায়া, হাসি অশ্রুর সমাবেশ। দুঃখবাদীরা বলেন, পৃথিবী বেদনাময়, দুঃখই সত্য, স্বাভাবিক। জীবন কেবল কষ্টের, নিরাশার, নিরানন্দের। মানুষের পরম তৃষ্ণা কেবল খুঁজে বেড়ায় তা'র তৃপ্তির আশ্রয়, সান্ত্বনার প্রলেপ। অশ্রুই সত্য, হাসি আকস্মিক। আশাবাদীরা বলেন, মৃত্যু থেকে অমৃত, অন্ধকার থেকে আলো, বেদনায় অবগাহন ক'রে আনন্দের দিকে মানুষের নিত্য প্রার্থনা। কলাশিল্প, সাহিত্য, কাব্য,—সমস্তই ত' আনন্দ-বেদনার ছবি !

ট্রেন চলেছে দ্রুত গতিতে। জানি গাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকবো না, শীঘ্রই নামতে হবে। কিন্তু এই অস্থায়ী বাসা, এই একান্ত এককতা বড় মধুর। আমরা এযুগের ব্যস্ত মানুষ, মানবযাত্রার বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে আমাদের সারা দিনরাত্রি কাটে। আধুনিক জীবনের সকলের বড় অভিশাপ হোলো, কোথাও তা'র স্থিরতা নেই। দুই হাত একই সময়ে অনেক রকম কাজে ব্যস্ত, নানাজাতীয় লোকের মধ্যে অবিশ্রান্ত চলাফেরা ; কত লোকের সঙ্গে কত বিষয়ে মস্তিষ্কের ব্যায়াম ; একই জায়গায় ব'সে কা'রো দুঃখে সহানুভূতি জানাই, কারো আনন্দ-পরিহাসে যোগদান করি। মন অক্লান্তভাবে নানাবিধ চিন্তা নিয়ে আমাদের ক্রিয়াশীলতাকে উৎসাহিত করছে। আমাদের চিন্তা ও কল্পনার একটি মাত্র বিষয় থাকলে নির্জনে কোথাও গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হ'তে পারতুম। কিন্তু এযুগে বিশ্রাম কোথাও নেই। আমাদের প্রত্যেকটি দিন সমস্তক্ষণ ভ'রে থাকে বিবিধ চিন্তা ও কর্মসম্ভারে। একই সময়ে ভাবছি সাহিত্যের কথা, দেশের কথা, নিজেদের ঘর সংসার ও উপার্জনের কথা, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে কুটুম্বিতার কথা, বন্ধুবান্ধবদের কথা, শিক্ষা ও পড়াশুনার কথা, আহার ও বিশ্রামের কথা,

স্নেহ ও ভালবাসার কথা, ঈশ্বর ও ধর্মের কথা, মানুষের মহত্ব ও নীচাশয়তার কথা। আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে এরা একই কালে অসংখ্য তরঙ্গের আঘাতে আলোড়িত করছে। এছাড়া আছে রেডিও-টেলিফোন-সিনেমা-সংবাদপত্র-হুজুগ-আন্দোলন। আমরা সকালে যাই অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে, মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধবাসরে এবং সন্ধ্যায় বিবাহ-সভায়। এর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সভা-সমিতি, লোকের অনুরোধ উপরোধ, উপদেশ, সুপারিশ, উমেদারি, তোষামোদ, নিজের স্বার্থ সুবিধা হিতাহিত, ভবিষ্যৎ চিন্তা ও সঞ্চয়বুদ্ধি। তা'র সঙ্গে আছে বিরক্ত, ভয়, আনন্দ, উদ্বেগ, চিন্তাবিকার, ভ্রান্তি, রাগ, বিদ্বেষ, মোহ, কর্তব্যবোধ। খাবারে মাছি না পড়ে, গায়ে নোংরা না লাগে, শরীরে রোগ না ঢোকে, সংসারে অশান্তি না ঘটে, খরচের হিসাব না বাড়ে, লোকে না ঠকায়, সাধুতা মার না খায়, অপঘাত কিছু না ঘটে,—সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এছাড়া সমালোচকের নিন্দারটনা আছে, পরশ্রীকাতরতার নিশ্বাস আছে, লোকের ঈর্ষা আছে, অবিচার আছে, অপবাদ আছে, আক্রমণ আছে,—এদের হাত থেকেও আত্মরক্ষা করা চাই। কিন্তু এদের পাশে আবার এই বিচিত্র সংসার যাত্রার ভিতরে যখন দেখি কিছু করুণ ভালবাসা, কিছু বা মহত্বের উদাহরণ জড়ানো,—তখন ওদের আনন্দেও যোগ দিতে হয়। সুতরাং এত ব্যস্ততা, এমন দৈনন্দিন দীর্ঘ কর্মতালিকার প্রতিটি দফা সম্পাদন করার পর আমরা মজুরের মতো ক্লান্ত, সমস্তদিন ধরে খাবার খোঁজা পাখির মতো পরিশ্রান্ত। আমাদের দাঁড়াবার, বিশ্রাম নেবার, ঘুমোবার, আহার করবার,—কোথাও একটু সময় নেই। যাদের দৃষ্টি আছে, তারা জানে এই বিংশ শতাব্দির দ্রুততা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে আমাদের আয়ুকে ক্ষয় করছে। প্রকাণ্ড একটা যন্ত্র ঘুরছে বৈদ্যুতিক শক্তিতে, আমরা তা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ওই যন্ত্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে

আমরাও ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে গেছি। এই শতাব্দীর দ্রুততা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে, আমাদের সবই চাই তাড়াতাড়ি। দ্রুত সৌভাগ্য লাভের জন্য আমরা জুয়া অথবা লটারি খেলতে বসি, দ্রুত যশ আর প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা হাস্যকর প্রচারকার্য করি, দ্রুত উন্নতির জন্য আমরা প্রতিযোগীকে হটিয়ে দিই, তাকে অবনত করি, তার যোগ্যতার মূল্য অস্বীকার করি। কোথাও সবুর নেই, প্রশান্ত বিরতি নেই, তপস্যার অবকাশ নেই। এই সর্বনাশ দ্রুততার ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি।

আমরা লেখক, লেখা আমাদের ধর্ম, আমাদের বুকের রক্ত, আমাদের জীবন মরণ। কিন্তু এ কথা যদি কেউ মনে ক'রে থাকে, এই অতিব্যস্ত শতাব্দিতে কারো হাতে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবে, সে ভুল। মহৎ সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে নিরুদ্বেগ জীবনে, মন্থর অবকাশের পথে, নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। গভীরের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি থাকলে মহৎ আর্টের মণিমুক্তা উঠে আসে, কিন্তু জীবনের সেই স্বচ্ছ গভীরতা আজ অসহ্য অস্বস্তির তরঙ্গে আলোড়িত। আমাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। প্রতিভা আছে অনেকের, কিন্তু সে প্রতিভা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণাদলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে, কোনো একক জীবনে তা'রা দানা বেধে আর উঠবে না। আজ প্রতিভা অপেক্ষা যোগ্যতার আদর বেশি, সাহিত্য অপেক্ষা সাংবাদিকতা। কে বেশি যোগ্য, কে বেশি কাজের, কে বেশি সক্রিয়, অল্প সময়ে কে বেশি পরিমাণে দিতে পারে, কে বেশি প্রয়োজনীয়—এই হলো এ যুগের কথা। যারা যোগ্য নয়, তা'রা এই বিংশ শতাব্দির ঘূর্ণায়মান বৃহৎ যন্ত্রটার থেকে ছিটকে প'ড়ে দুর্ভাগ্যের দিকে। জীবনের জুয়া খেলায় সে পরাজিত, সে হত-ভাগ্য, সে মৃত্যুপথ যাত্রী। হোক সে প্রতিভা, সে মহৎ, হোক সে বড় আর্ট সৃষ্টির ক্ষুধায় আতুর—তবু সে ব্যর্থ। বিংশ শতাব্দীর যোগ্য সে নয়।

ট্রেন চলেছে শরৎকালের আকাশের পথের দিকে। মধ্য-ভারতের গ্রাম, স্টেশন, শহর—এরা উত্তর ভারতের মতো জন-বহুল নয়। দূরে কোথাও প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, কোথাও বা হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অপরূপ নিদর্শনস্বরূপ এক একটি প্রাকারের অতীত ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান। আমাদের জীবনের সঙ্গে ওদের কোনো যোগ নেই। ওরা কোন্ যুগের, কোন্ কালের, কোন্ মানব সভ্যতার সাক্ষ্য, তা'র হিসাব করা কঠিন। সাম্প্রতের যবনিকা তুলে ধরলে দেখা যায়, প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির পিছনে যে আত্মদর্শনের সর্বকালজয়ী তপস্যা ছিল, তারই ওরা সাক্ষ্য। ওদের অঙ্গে অঙ্গে সেই তপস্যারই কারুকলা, ওরা সকলের প্রণম্য, সকলের আশ্রয়স্থল। সেই যুগে বিংশ শতাব্দি ছিলনা, ছিলনা রেডিও-সিনেমা-এইরো-প্লেন, সংবাদপত্র! সেকালে ছিলনা যন্ত্রের যন্ত্রণা, বিদ্যুতের ঝঞ্চনা, বিজ্ঞানের মন্ত্রণা। সেই আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য যুগে ছিল হিন্দুর সংস্কৃতিতে মহৎ আর্ট সৃষ্টির কল্পনা, হৃদয়ের প্রসারতা আর বিশালতা, আত্মার রহস্যলোকের বাণী উদ্ঘাটনের সাধনা।

সেই যুগ অতীত। সেই মুনি অতীত ; সেই ঋষি ওই ভাঙা মন্দিরের পঞ্জরাস্থির স্তরে স্তরে। সেই তাদের বিয়োগান্ত মৃত্যুশ্বাস এখনও ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের ট্রেন এসে থাম্‌লো গোয়ালীয়রে।

মধ্যভারত আমাদের কাছে কিছু রহস্যময়। যার নাম মধ্যভারত সেই ভূভাগ মোটামুটি উড়িষ্যার পশ্চিম থেকে

রাজপুতানা অবধি বিস্তৃত। এই ভূভাগের নানা অংশ অরণ্য, উপত্যকা, জলাভূমি, মরুভূমি, এমন কি নেই-মানুষের-দেশ প্রভৃতিতে নিত্য আকর্ষণের বস্তু। এদিকে ঋতুর মধ্যে বর্ষার ভাগ কম, কিন্তু শীত প্রবল এবং গ্রীষ্ম প্রবলতর। অরণ্যে অরণ্যে কোথাও হয়ত বসন্তকালের তন্দ্রাবেশ আছে কিন্তু তা অতি ক্ষণস্থায়ী। গ্রীষ্মের প্রবল তাপে এবং শীতের তুহিন যন্ত্রণায় রস-কস কোথাও বিশেষ দেখা যায় না; চরমপন্থীদের অত্যাচারে মডারেটরা একরূপ নির্বাসিত। কিন্তু তবু, বর্ষার স্বল্পতা সত্বেও শস্য শ্যামল প্রান্তর এবং অরণ্যাণীর সৌন্দর্য কম দেখা যায় না। মধ্যপ্রদেশ মধ্য ভারতের অন্তর্গত বৈ কি। জববলপুর, নাগপুর, বিলাসপুর রায়পুর পেরিয়ে চলেছো,—দুই চোখে মেখে দেখো, শ্যামায়মান প্রকৃতির কাজলের রেখা। নিবিড় ভাবে মনে পড়বে শৈশবকালের রূপকথা। বস্তুত, আমাদের দেশে রাজপুত্র আর কোটাল-পুত্রের যত গল্প, সাত সাগর পেরিয়ে সাতশো রাক্ষসীর দেশে সোনার খাটে যে রাজকন্যা ঘুমিয়ে,—যার জন্য চিরকালের রাজপুত্র চিরকালিনীর দুরাশার দুঃসাহসের পথে বেরিয়ে পড়েছে যুগে যুগে,—সেই পরীকথার গল্পাবেশ মধ্যভারতে এসে মিলে যায়।

আঙুলে গুণলে দেখা যায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা মধ্যভারতে দেশীয় নরপতির সংখ্যা বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি—সকল দলের রাজাই আছেন। এঁদের প্রায় সবারই শাসন ব্যবস্থা ভারত সরকারের অলক্ষ্য সঙ্কেতে চলে। যেখানে তা চলে না অথবা কম চলে, সেখানকার শাসন প্রণালী রহস্যময় হয়ে ওঠে। সেখানকার সংবাদ বাহিরে অনেক সময় এসে পৌঁছতে পারে না,—একটা মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা চালিয়ে তাঁরা কেমন যেন মায়াজাল বিস্তার করে রাখেন। তাঁদের সম্বন্ধে সকল রকম সম্ভব-অসম্ভব শ্রদ্ধেয়-অশ্রদ্ধেয় গল্পগুজব শুনতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতের মতো মধ্যদেশে ঘন সন্নিবিষ্ট জনবসতি নেই এ দৃশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। দূরে দূরে গ্রাম, কাজ কারবার কম, শস্যক্ষেত্রের স্বল্পতা, যানবাহনের অপ্রাচুর্য, রেলপথ ছাড়া ছাড়া—এইগুলো হয়ত প্রধান কারণ। যে ঐশ্বর্য বাঙ্গলায়, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, সেই সম্পদ্ মধ্যভারতে চোখে পড়ে না। কানপুর থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'লে এই কথাই মনে হবে। মাঝখানে ওরাই নামক একটি ছোট শহর পাওয়া যায়, কিন্তু ঝাঁসী পর্যন্ত আর কোনো উল্লেখযোগ্য শহর দেখা যায় না। পথের ধারে কোথাও নদী নালা খাল বিল একরূপ নেই বললেই হয়, কি শীতে কি গ্রীষ্মে ভারতের এই অংশের প্রান্তর নিরন্তর ধু ধু করতে থাকে। উত্তর ভারতে প্রখর গ্রীষ্মেও অন্তত নদী ও খালের জল সরবরাহ আছে; সেখানে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা প্রবাহিত, জলধারা যন্ত্রের অগণ্য সুব্যবস্থা, কিন্তু এই মরুদেশে সেই বিলি বন্দোবস্ত অতি কম। জলের কাছাকাছি মানুষের বাসা ঘন হয়ে গড়ে ওঠে, সেই কারণে মধ্য প্রদেশে নদীর তট ছাড়া আর কোথাও তেমন জনপদ সৃষ্টি হয়নি।

ঝাঁসীর ঐতিহাসিক প্রাধান্য জগৎবিখ্যাত। এই ভূভাগের সমস্তটাই বুঁদেলখন্দের অন্তর্গত। দিক দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ভিতরেই ঝাঁসী শহর অবস্থিত। প্রান্তর ও শহর অসমতল এবং বালুময়। স্টেশনের কাছেই নূতন ঝাঁসী শহর এবং সুন্দর পথঘাট গোরা ছাউনীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। দৃশ্যটা পীড়াদায়ক মনে হোতো না যদি দেখতাম ঝাঁসী শহরও এই অনুপাতে দর্শকের চক্ষে সুদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু তা কোথাও হয়নি। আগ্রায় বলো, আম্বালায় বলো, রাওয়ালপিণ্ডিতে বলো, কাশীতে বলো, লুধিয়ানায় বলো,—গোরা ছাউনীর পথ ঘাটের সঙ্গে শহরের আকাশ পাতাল প্রভেদ। সরকারী সুবিধা ও স্বার্থের জন্য জনসাধারণের সকল

প্রকার সুখ ও স্বস্তিকে নিষ্ঠুরভাবে সর্বত্র বলি দেওয়া হয়েছে। নকল ঝাঁসী হয়ে উঠেছে অহঙ্কারে স্ফীত এবং আসল ঝাঁসী দারিদ্র্যে, হতমানে, নতশিরে ধূলিধূসর,—যেন প্রচীন বটের ছায়ায় এক ছিন্নবাসা ভিখারিণী ধূলায় আর অপমানে আঁচল পেতে শুয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে।

ঝাঁসীর সঙ্গে যাঁর নাম চিরকালের জন্য জড়িত তিনি ঝাঁসীর ইতিহাসের মধ্যেই বন্দী নন্, তিনি আজও ঝাঁসীর পথে ও প্রান্তরে, জনসাধারণের প্রত্যহের স্মৃতিতে প্রতিফলিত। তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ। কালের যাত্রায় মাত্র এই সেদিনের কথা, ইংরাজ আমলে তিনিই প্রথম সর্বভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন, মরণান্তকাল অবধি তিনি ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। সেই সুপ্রসিদ্ধ আন্দোলনকে সিপাহীবিদ্রোহ নামে কুখ্যাত করা হয়েছে। নগর পরিক্রমার সময় সেই মহীয়সী বীরাঙ্গণার পঞ্চভৌতিক দেহের অণুপরমাণু অনুভব করা যায়। তাঁর আত্মীয় স্বজন এখনো কোথাও কোথাও বর্তমান। কয়েক বছর আগে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নামে কুকীর্তি প্রচার করার অপরাধে এক ইংরাজ লেখক অভিযুক্ত হয়েছিলেন। রাণীর আত্মীয় স্বজন তাঁর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলেন।

সাঁইয়া গেট, হনুমান গেট প্রভৃতি দশটি তোরণদ্বারের মধ্যে সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত এই শহর। ঝাঁসীর প্রধান আকর্ষণ লক্ষ্মীবায়ের দুর্গ। এই দুর্গে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই, গোরা ছাউনির দপ্তরে আবেদন জানালে ছয় আনা ব্যয়ে একটি পাস পাওয়া যায়, সেই পাস দেখালে দুর্গরক্ষী সৈন্য দর্শককে ভিতরে প্রবেশ করবার অনুমতি দেয়। দুর্গটি কি কারণে জানি না, অতিশয় সুরক্ষিত। গোরা প্রহরী দর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলে। রাণীর ইতিহাস তারা বলে পাখীপড়া বুলির মতো ; বলা বাহুল্য

সে ইতিহাস ইংরেজী রঙে আর ভারতীয় ঢঙে কিম্ভূত কিমাকার। ভিতরে ছবি তুলতে দেওয়া হয় না, সেখানে সংশয় আছে। আমি ক্যামেরায় ছবি নিয়েছিলাম কিন্তু সে ছবি দুইজন গোরা বলপূর্ব্বক ছিনিয়ে নিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিল। তারা সেখানে প্রভু, আমরা 'প্রভুচরণ রক্ষিত।'

দুর্গটি প্রাচীন পাথরে নির্ম্মিত একটি গোলকের মতো। ভিতরে রাণীর রণসজ্জার নানা উপকরণ রক্ষিত আছে কিন্তু সেগুলি দর্শকের দৃষ্টিগোচরে আনা হয় না। দুর্গের প্রথম বৈশিষ্ট্য হোলো, হিন্দু স্থাপত্য পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। আগ্রায়, দিল্লীতে দুর্গগুলির যে ভঙ্গী, এখানে সে ভঙ্গী অনুকৃত নয়।

হিন্দুর সকল দুর্গই প্রায় পাহাড়ী উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত। যোধপুর বলো, জয়পুর বলো, বিকানীর বলো, উদয়পুর বলো, গোয়ালীয়র বলো—প্রায় সকল দুর্গই উচ্চ ভূভাগে অবস্থিত। সহজে আরোহণ অথবা অবরোহণ সেখানে কষ্টদায়ক; শত্রুকে যুদ্ধকালে অনেক বেগ পেতে হয়। প্রত্যেক দুর্গটি যেন রাজমুকুটের ন্যায় এক একটি রাজ্যের কপালে তিলকের মতো অঙ্কিত।

দুর্গের ভিতরে উদ্যানগুলি লালবর্ণের পুষ্প লতায় আকীর্ণ। পাথরের জোড়গুলি খুবই প্রাচীন; অনেক জায়গাতেই ধ্বংসের সঙ্কেত দেখা যায়। নির্জন প্রস্তরগর্ভের কন্দরে কন্দরে পুরাতন ইতিহাসের করুণ নিশ্বাস জড়ানো,—পাথার পুরীর ভিতরে কেমন একটা শৈবালাচ্ছন্ন মায়ারহস্যের অন্ধকার সমস্তটাকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুর্গের মাঝামাঝি একটা হামাম, লতায় পাতায় শ্যাওলায় পাথরের গন্ধে আলোছায়ায় কেমন একটি অপরূপ নীরবতা সেখানে বিরাজ করছে। প্রকাশ্য সূর্যের আলোতেও সেই অন্ধগর্ভ গুহার ভিতর থেকে আর্ত ঝিল্লিরব শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই বিদীর্ণ ঝিল্লিরবের সঙ্গে যেন বীর নানাসাহেব আর তাঁতিয়া তোপির সর্বশেষ ভগ্নকণ্ঠের প্রার্থনা ফুটে উঠেছিল। আমাদের

প্রহরী গোরা সৈন্যের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সত্ত্বেও কেমন যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধায় আর সম্মানে সেখানে আমরা কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে প্রান্তর পেরিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হয়। সঙ্কীর্ণ ধূলিধূসর পথগুলির দুই ধারে সামান্য দোকানদানি। শহরে সংস্কার কোথাও নেই,—জীর্ণ ও ভগ্নবসতি পুরাতন ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষের পরিচয় দেয়। পথগুলি বালুময়, কোথাও জল ও জলাশয়ের চিহ্ন নেই। বর্ষার বৃষ্টিধারা এ অঞ্চলে অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। শীতের রাত্রিগুলি তুহিন শীতল, বৎসরের আর সকল সময় অগ্নিকুণ্ডের জ্বলজ্বালার ন্যায় সমগ্র ঝাঁসী দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অনেকটা মরুভূমির স্বাদ পাওয়া যায়।

শহরের মাঝামাঝি রাণী লক্ষ্মীবায়ের একখানি প্রাসাদ আজও বর্তমান; আপাতত সেটি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের অধিকারে। শোনা গেল এই প্রাসাদ আগেকার মতোই অক্ষত আছে, ভেঙে চুরে কোথাও পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। প্রাসাদটির রঙ শ্বেত ও চন্দনবর্ণ, হিন্দুস্থানী জমিদার বাড়ীর ভঙ্গীতে সেটি নির্মিত। আগেকার কালে বাগানবাড়ীর রেওয়াজ ছিল না। বাড়ীটাই ছিল বাহির থেকে দৃশ্যমান, পুষ্পোদ্যান অথবা সরোবর থাকতো ভিতর মহলে; পর্দানসীন সুন্দরীদের পক্ষে তখনকার অন্দর মহল বিচরণের ক্ষেত্র ছিল।

শহরে আর বিশেষ কোনো দ্রষ্টব্য বস্তু নেই। কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি—এমন কোনো কিছুর চিহ্ন নেই যার জন্য ঝাঁসী খ্যাতিলাভ করতে পারে। দুর্গ আর গোরা ছাউনি না থাকলে এই শহর হয়ত ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যেতো। শহরের উত্তরাংশে একটি শৈবালাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ জলাশয় বর্তমান, সেই বিলের তীরে তীরে কালের প্রহরীর ন্যায় একটি প্রস্তর-পেটিকা গম্বুজের আকারে অবস্থিত। এগুলি দুর্গপ্রাকার ও

তোরণের বাহিরে। কল্পনা করা গেল, উদ্যান সহচরীদের নিয়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ হয়ত এই করুণ নির্জন হ্রদের তীরে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হতেন। অরণ্য পুষ্পদল নুইয়ে পড়তো তাঁর পদতলে, দিনান্তের আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজতো মন্দিরে মন্দিরে, দীপমালা জ্বলে উঠতো তাদের সঙ্গে হ্রদের কূলে কূলে। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন পসারিণী নারীর দল পরিশ্রান্ত দেহে সেই ঘোলা জলে নেমে গা ধোয়, নোংরা জল নিয়ে ব্যবহার করে শহরের ভিতরে রোগের বীজাণু বিস্তার করে। জলাশয়ের তীরে উচ্চ ভূমিতে আজও একটি প্রাচীন শিবমন্দির দণ্ডায়মান—সেখানে আজও শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ হয় বটে কিন্তু সেদিনকার সেই যৌবন আর নেই, নেই সেই গীতিকবিতার আবেশ, এখন তপ্ত হাওয়ার হাহাকারে জরাজীর্ণের নিশ্বাস করুণ বিরহ বেদনায় রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ আর গমের ক্ষেতের বিজন প্রান্তর ব্যথায় ঘনিয়ে তোলে।

ঝাঁসী থেকে আগ্রার পথে গোয়ালীয়র আর ঢোলপুর রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পথের মধ্যে ছোটখাটো ভূঁইয়া রাজার সংখ্যা কম নয়। গাড়ীতে বসেই লক্ষ্য করা যায় এক এক রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট। এদের মধ্যে যারা কিছু অবস্থাপন্ন তারা দুর্গ তৈরি করেছে উপত্যকায়; গ্রাম রক্ষার জন্য প্রহরী মোতায়েন রেখেছে। রেলগাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে একে একে অনেকগুলি রাজদুর্গ ও রাজধানী চোখে পড়ে।

কিন্তু গোয়ালীয়র বোধ করি সাধারণ স্বাধীন করদ রাজ্যগুলির মধ্যে অসাধারণ। বৃটিশ ভারতের শহরগুলির নির্মাণ কৌশল সরকারি সুবিধার মুখ চেয়ে অনেক সময় প্রস্তুত, কিন্তু গোয়ালীয়রে পৌঁছে দেখা গেল, জাতির সর্বাঙ্গীন নিষ্ঠা ও স্নেহে এই শহরের সাজসজ্জা নির্মিত। প্রথমেই চমক লাগে শহরের সুন্দর ও মসৃণ পথঘাটগুলি দেখে। বৃক্ষচ্ছায়াবহুল পথগুলি অবাধে বহুদূর অবধি চলে গেছে। প্রধানতঃ গোয়ালীয়র তিনভাগে বিভক্ত।

প্রথমটি রাজ শহর, দ্বিতীয়টি সম্ভ্রান্ত পল্লী, এবং তৃতীয়টি গোয়ালীয়র দুর্গের নিকটবর্তী জনপল্লী। রাজ শহরের চারিদিকে সুদৃশ্য উদ্যান এবং রাজপুরুষগণের প্রাসাদ। মহারাজার প্রাসাদটি ঐশ্বর্যে, আড়ম্বরে, সম্পদে যেমনি মনোরম তেমনি সুবিস্তৃত। দেখে মনে হয় তার কূল কিনারা নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে মাইল খানেক পথ পার হয়ে গেলে রাজার প্রকাণ্ড মন্দির এবং তারই চারি পাশে শহরের হৃদপিণ্ড। নিকটে টাওয়ার ক্লক, স্বর্গত মহারাজার একটি সুদৃশ্য প্রস্তর প্রতিমূর্তি ; হিন্দু ভাস্কর্যের একটি অপরূপ নিদর্শন। এখানকার বাজার ও বিপণি বেসাতি কলিকাতার চৌরঙ্গীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিকটে যে বিশাল মন্দির সেখানে নগ্নপদে ও মাথায় পাগড়ি বেঁধে প্রবেশ করাই বিধি। দেশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতির পর এখানে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। ভিতরে শাসন ব্যাপারে কতখানি জল এবং কতখানি দুধ তার অবশ্য কোন হদিস পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বাহির থেকে ভ্রমনকারীরা গোয়ালীয়রে গিয়ে দুঃখিত হবেন না, বরং চারিদিকে চেয়ে চেয়ে তাঁদের মন খুশিতেই ভরে উঠবে।

জনপল্লী যাকে আগে বলেছি সেটি গোয়ালিয়র দুর্গের নিচে একটি সুবিস্তৃত শহর। সেটি পুরাতন দিল্লীর শহরতলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহরে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা বহু। শহরটি পুরাতন হলেও সমৃদ্ধ এবং সেখানে ভ্রমণ করে সহজেই অনুভব করা গেল গোয়ালীয়রের বালক মহারাজাকে তারা ধর্মের প্রতিভূ বলেই মনে করে। আধুনিক যুগের বস্তুসম্ভার ও শিক্ষার উপকরণ গোয়ালীয়রে দুষ্প্রাপ্য নয়। শহরের যেটি পৌরসভা তার কৃতীত্ব ও যোগ্যতা পদে পদেই আমাদের চোখে পড়তে লাগলো। যানবাহনের চলাচল প্রচুর ; মহারাজার একটি নিজস্ব ষ্টেট রেলওয়ে আছে। বহুদূর অবধি শস্যশ্যামল প্রান্তর রাজ্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়।

জনপল্লী সীমানায় কতকগুলি পুরাকীর্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে দুটি সমাধি মন্দির সর্বপ্রধান। ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী ও গায়ক তানসেনের সমাধি যে এখানে অবস্থিত আমাদের আগে জানা ছিল না। সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারা মৃত্যুকালে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁর সমাধি মন্দিরে যেন ঐশ্বর্যের কোনো আড়ম্বর না থাকে; যেন এক অখ্যাত নগণ্য স্থানে তাঁর সমাধিক্ষেত্র কোনো মালঞ্চ বীথিকার তলায় লুকানো থাকে, যেন তাঁর সমাধি বেদীতে নিত্য প্রভাতে আরণ্যক ফুল ঝরে পড়ে—আর তাঁর কোনো উচ্চাশা নেই। সেজন্য নিজামুদ্দিন আউলিয়ার একান্তে তাঁর সমাধি অনেকটা যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। তানসেন সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সঙ্গীতকলায় যিনি আমরণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠ একদা সমগ্র ভারতের অধ্যাত্ম আত্মাকে উদ্বোধিত করেছিল তিনি জানতেন সকল ঐশ্বর্য আড়ম্বরের অলীকতা—সেই কারণে প্রান্তরের একান্তে সামান্য একটি প্রস্তর মন্দির তাঁর সমাধির উপর নির্মিত রয়েছে। সমগ্র গোয়ালীয়র তাঁর দেহাবশেষ বুকে ধরে চিরদিনের জন্য ধন্য হয়েছে।

তানসেনের সমাধি মন্দিরের পাশেই সুবিখ্যাত সাধু গোউস মহম্মদের বিশাল স্মৃতিমন্দির। উত্তর ভারতে একদা গোউস মহম্মদের ন্যায় এত বড় ধার্মিক ফকির আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী এক মহা তপস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম ধর্মের সকল নীতি ও আদর্শবাদ তাঁর জীবনে ও কর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গোয়ালীয়রের হিন্দু মহারাজার রাজ্যে মুসলমান সাধুর প্রতি এই সম্মান বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য।

এর পরে যেটি সর্বপ্রধান আকর্ষণের বস্তু সেটি হিন্দু-ভারতের পক্ষে একটি বিস্ময় বললেও অত্যুক্তি হবে না। যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর প্রভৃতি আছে জানি,—জানি বহু পাহাড়ের চূড়ায় বহু

সংখ্যক দুর্গই অবস্থিত, কিন্তু গোয়ালীয়র দুর্গের যে সম্ভ্রম ও মহিমা, তার যে বিস্তার ও গৌরব সে অসামান্য। এই দুর্গ রাজা মানসিংহের হাতে নির্মিত, এজন্য এটি মানমন্দির নামেই অভিহিত। গোয়ালীয়র পৌঁছবার আগে বহুদূর থেকে এই দুর্গ নজরে পড়ে, প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গে সমগ্র গোয়ালীয়রের জনসাধারণ এই দুর্গের দিকে চেয়ে একবার নমস্কার জানায়। মহাকালের ভ্রূকুটি, ইতিহাসেয় উত্থান পতন, মানুষের বংশ পরম্পরা,—সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে এই দুর্গ অটল অচল আপনার মহিমায় বিশাল পার্বত্য ভূভাগের উপরে দাঁড়িয়ে বীর্যবত্তা ও হিন্দু বিক্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দুর্গের প্রবেশ পথেই একটি ঢালু পাহাড়। একদিকে পুরাকালের হিন্দু স্থপতি ও ভাস্কর্যের একটি প্রকাণ্ড মিউজিয়ম। সেখানে নানারূপ অদ্ভুত দেবদেবীর প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি। নানাযুগের ও নানাকালের খোদাই করা প্রস্তর শিল্প সম্ভার। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় যুগে স্থাপত্যশিল্প যখন উন্নতির শিখরে উঠেছিল সেই কালের অসংখ্য চিহ্ন সর্বত্র আপন আপন মহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে পাহাড়ি পথ পার হয়ে গিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। ভিতরে বিশাল উদ্যান, মাঝে মাঝে কয়েকটি অস্ত্রাগার, পথগুলি সুমার্জিত ও সুদৃশ্য। কতকগুলি কক্ষে দর্শকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। দুর্গের চতুঃসীমানা এত বিস্তীর্ণ যে, একদিনে অথবা এক বেলায় ভ্রমণ করে তার পরিমাপ করা কঠিন। উত্তর ভাগে রাজা মানসিংহের বিখ্যাত মর্মরপ্রাসাদ। তারই সোপানাবলী অতিক্রম করে প্রাচীন ও ভগ্ন প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। উপরের যে জাজ্জ্বল্যমান কাঠামো বহু যোজন দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয় ভিতরে তার দারিদ্র্যবেশ,— একেবারে রিক্ত ও নিঃস্ব। কক্ষে ও অলিন্দের নির্জন ছায়ায় যেন একটা মরা ইতিহাস অসাড় ও স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও

কিছু নেই, বিন্দুমাত্র চিহ্নও কেউ রেখে যায় নি,—তাই যেন সবাকার অদৃশ্য নিঃশব্দ পদসঞ্চার চারিদিক থেকে অনুভব করলে গা রোমাঞ্চ হয়ে আসে। সেই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে পাথুরে কীটের করকরানি, নামহারা এক একটা পাখীর চূর্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ, বায়ুর একটি ঝলক—এতেই যেন চমকে উঠতে হয়।

সোপান পেরিয়ে প্রাসাদের ভিতর মহলে প্রবেশ করার পথে এক শ্বেত গুম্ফ শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ রক্ষী বসে রয়েছে। তার বার্ধক্যের সঙ্গে এই দুর্গের কেমন একটা সহজ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া গেল। লোকটা এখানকার বহুকালের সাক্ষী। তার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

প্রাচীন ইতিহাসের আত্মার চেহারা কেমন জানিনে। হয়ত ভগ্ন, হয়ত বা এমনিই জরা স্থবির। লোল চর্মের ফাঁকে ফাঁকে তার শিরাবহুল জীর্ণতা কেমন যেন অব্যক্ত আতঙ্কের সংবাদ আনে; দুই চক্ষে তার অন্তিম অতীতের পাণ্ডুর ছায়া। সে যেন প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্যের করুণ ভগ্নাবশেষ।

আমাদের হাতে ক্যামেরা ছিল। বৃদ্ধ করযোড়ে মিনতি জানালো, তসবির মৎ উঠাইয়ে, বাবুজি, হমারি দশ রুপেয়াকা নোকৃরি ছুট্ যাগা।

প্রশ্ন করলাম, ছবি তুললে চাকরি যাবে কেন?

সে বললে, আংরেজ লোককা হুকুম।

দুর্গ পরিক্রমা শেষ করে আমরা আবার পাহাড় থেকে অবরোহণ করে শহরে এসে উত্তীর্ণ হলাম।

সমগ্র ভারতবর্ষ আগে ছিল অতি বৃহৎ, কিন্তু আধুনিককালে ভারতবর্ষের আকার বড় ছোট হয়ে গেছে। দুর্গম, দুরারোহ, অনন্ত, বিপদসঙ্কুল—এই সকল শব্দ সাধারণ ভ্রমণকারীকে আর উচ্চারণ করতে হয় না। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে এবং মাঝামাঝি যারা দেশ ভ্রমণে বেরোত তারা সংসারের সম্পর্ক চুকিয়ে, উইল, ক'রে, নাতি নাৎনীকে আশীর্বাদ ক'রে পথে বেরিয়ে পড়তো—তারা ফেরবার আশা করতো না। এত কাণ্ড ক'রে কোথায় যেতো তারা? যেতো গয়া, কাশী, বৃন্দাবন। গয়া যেতো আড়াই মাসে, কাশী তিন মাসে, বৃন্দাবন পাঁচ মাসে। পথে বাঘ, ভাল্লুক, ডাকাত, মহামারী। কেউ তীর্থযাত্রা করলে সেকালে পাড়ায় পাড়ায় কান্নাকাটি পড়ে যেতো।

আজকে কাশী যেতে এরোপ্লেনে লাগে তিন ঘণ্টা, ট্রেনে লাগে এগারো ঘণ্টা। একজন কেরাণী শনিবারে আপিস থেকে বেরিয়ে কাশী গিয়ে পুণ্যসঞ্চয় ক'রে সোমবারে ফিরে আপিস করতে পারে—আপিসের বড়বাবু জানতেও পারেন না। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই, দূর হয়েছে নিকট, দুর্গম হয়েছে সহজ এবং অজানা অপরিজ্ঞাত যা কিছু জায়গা ছিল সে সব অতি পরিচিত হয়ে এসেছে। আজকে রাজপুতানার কথা বলতে গিয়ে একটু সঙ্কোচ বোধ করছি। মাত্র একশত বছর আগে রাজপুতানা ছিল আমাদের কল্পনার অতীত-লোকে, আজ সামান্য গাড়ীভাড়া দিলে এক সপ্তাহের ভিতর তিনবার সেখানে যাতায়াত চলে। আমার বিশ্বাস, রাম রাজত্বেও এতখানি সুবিধা ছিল না। মানুষের জ্ঞান ও কৌতূহল এত বেশি বেড়ে গেছে যে, আজ সহজ এবং সুগম দেশের কথা ব'লে তাদের আর ভোলানো চলবে না।

রাজপুতানা একদা ভারত সীমান্ত পথের অন্তর্গত ছিল, তখন এই দেশের সীমানা ছিল অনেক বড়—আধুনিক মানচিত্র দেখে তার হদিস্ পাবার উপায় নেই। এই প্রদেশ ছিল

ভারতবর্ষের সিংহ দরজা, এই জাতির উত্থানপতনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য বিজড়িত ছিল। আজ রাজপুতানার সীমানা ও পরিধি ছোট হয়ে গেছে, মহাকালের ভ্রূকুটিতে বহু রাজা ও ক্ষুদ্র রাজ্য অজ্ঞাত ইতিহাসের অতল তলে তলিয়ে গেছে, আজ আছে সেই অতীত বীর্য শৌর্যের কঙ্কাল, আছে কতকগুলি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, আর আছে জীর্ণ জরাগ্রস্ত রাজপুতানার ক্ষুধার্ত মরুভূমি।

আধুনিক মানচিত্রে দেখা যায় উত্তরে পাঞ্জাব, দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে যমুনা ও পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং সিন্ধুদেশের মধ্যস্থলে রাজপুতানা অবস্থিত। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্র ও খণ্ডরাজ্য নেই। দিল্লী থেকে দক্ষিণে ও পূর্বে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য, এক শাসন থেকে অন্য শাসনে। এক একটি বড় রাজার অধীনে আবার ছোট দুই একজন রাজা আছেন। মহারাজার নীচে রাজা। জয়পুর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, ভূপাল, ইন্দোর, যোধপুর, যশলমীর, বিকানীর—প্রত্যেকটিই খণ্ডরাজ্য এবং প্রত্যেকটিই এক একজন মহারাজার শাসনাধীন। অনেকে মনে করেন সমস্ত ভারতবর্ষই ইংরেজের অধিকারভুক্ত, কিন্তু তা নয়, আজো ভারতবর্ষে সাতশতের বেশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বর্তমান, তারা বৃটিশ ভারতের এলাকার বাইরে, তাদের শাসন প্রণালী স্বতন্ত্র, তারা প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তবে প্রত্যেক দেশীয় নরপতিই এই চুক্তিতে আবদ্ধ যে, ইংরেজের সম্পর্ক-প্রাধান্য অর্থাৎ Superiority মেনে চলবেন। আমাদের বাংলা দেশেও এমন দেশীয় রাজা আছেন।

আমরা জানি বর্তমান দিল্লী সমগ্র ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র। ভারতের যে কোনো শহরে যেতে হলে দিল্লী থেকে সোজা পথ পাওয়া যায়। রাজপুতানার প্রধান পথ দিল্লী হয়ে। যাঁরা

কলকাতা থেকে ভ্রমণে যাবেন তাঁরা আগ্রা হয়ে গেলে পারেন। আমি প্রধানত রাজপুতানার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের কথা বলব।

দিল্লী ও আগ্রা দিয়ে গেলে রাজপুতানার প্রথম প্রধান শহর জয়পুর। কলকাতা থেকে দিল্লীতে গিয়ে যদি সন্ধ্যায় পৌঁছানো যায় তবে রাত্রের দিকে রাজপুতানাগামী সুবিধাজনক ট্রেন মেলে। দিল্লীর পরে দেশের চেহারাটা যায় বদলে। শস্যশ্যামল হিন্দুস্থানের সঙ্গে রাজপুতানার মিল নেই। পথের দুইধারে যতদূর দৃষ্টি চলে অনুর্বর প্রান্তর এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাবলা ও ফণীমনসার ছোট ছোট ঝোপ। পশ্চিমে গেলে ফণীমনসার ঝোপ অনেক দেখা যায়, এই কাঁটাগুলি প্রায়ই জলাভাব ও ঊষর ভূভাগের পরিচয় দিয়ে থাকে। সমগ্র পশ্চিম ভারত এবং বিশেষ ক'রে রাজপুতানা ধূলার দেশ। বনময় ফলশালিনী বাংলার যে স্বভাব-শ্যামশ্রী, রাজপুতানার পথে নেমে দাঁড়ালে তার চিহ্ন কোথাও মেলে না। বৎসরের যে কোন ঋতুতেই যাই না কেন, ট্রেনের কামরার ভিতরেও ধূলায় ধূলায় যাত্রীরা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মরুময় দেশ, অরণ্যের জটলা কোথাও নেই, উচ্চপর্বত কোথাও দেখা যায় না সুতরাং রাজপুতনায় বৃষ্টির পরিমাণ অতি অল্প। মেঘের আবির্ভাব ঘটতে দেখেছি কিন্তু তার স্থায়ীত্ব বড় কম। গ্রীষ্মকালে সমগ্র রাজপুতানা অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে, আবার শীতকালে প্রবল শীতে হাত পা অবশ হয়ে যায়। কিন্তু আবহাওয়ার একটা প্রাকৃতিক গুণ এই যে, প্রবল গ্রীষ্মের দিনেও সূর্যাস্তের পর সুশীতল বাতাস বয় এবং প্রচণ্ড শীতের সময়েও মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ বাতাসে ঠাণ্ডাজলে স্নান করা অতি আরামদায়ক। রাজপুতানার জল বাতাস অতি স্বাস্থ্যকর।

নূতন দেশের প্রথম পরিচয় মেলে জীবজন্তু দেখে। আমরা কাক-কোকিল গরু-বাছুর দেখি আমাদের মাঠে ঘাটে। রাজ-

পুতানায় পদার্পণ ক'রে দেখি মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে হরিণের পাল, তাদের ছুটোছুটি যেন ছবির মতো। মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে টিয়া চন্দনা কাকাতুয়ার দল, পথে ঘাটে অবারিত চ'রে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ময়ুর। ময়ুরে হাতের খাবার ছোঁ মেরে নেয়। আকাশে মেঘ নেই, মাটিতে জল নেই, প্রান্তরে অরণ্য নেই কিন্তু এমন একটি রুক্ষ রূপ আছে সমস্ত রাজপুতানা-কে ঘিরে যে, তার মাধুর্য আসামান্য। রঙের বৈচিত্র্য কোথাও নেই সেইজন্য যে কোন শহরে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় যে, রঙের ক্ষুধা মানুষ মিটিয়েছে তার পোষাক পরিচ্ছদে, রঙ মাখিয়ে-ছে তার ঘরের দেওয়ালে, রঙ ছড়িয়েছে পথে ঘাটে দোকানে বাজারে। মেয়েরা চোখে বুলিয়েছে রঙ, নখে মাখিয়েছে রঙ। কেবল তাই নয়। ময়ুরের রাজ্য, সেইজন্য ময়ুরের ভঙ্গী সর্বাঙ্গে ধারণ করেছে মেয়েরা। ময়ুরের ঝুঁটির মতো মেয়েরা কপালে দোলায় সোনার ঝুম্‌কো, ময়ূরের পেখমের অনুকরণে পরে ঘাগরা, —সবাই যেম ইরাণী নর্তকী। একজন মরুবালিকার সর্বাঙ্গে অন্তত সাত রকম রঙের আবরণ আর আভরণ দেখা যায়। পসারিণীরা যখন দল বেঁধে যায়, মনে হয় তারা যেন রাজপুত্রের বিলাসাগার থেকে বেরিয়ে এলো। তারা একটা অদ্ভুত একঘেয়ে গান গেয়ে যায় পথে পথে—সে গান যেন দিগন্তব্যাপী মরুভূমির ক্ষুধিত আত্মার সকরুণ রাগিণী ; সেই গানে হরিণের দল উৎকর্ণ হয়ে তাকায়, ময়ুর-ময়ুরী স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

জয়পুরের পথ যত মরুময়ই হোক, জয়পুর আধুনিক শহর। স্টেশন থেকে আরম্ভ ক'রে যতদূর পূর্বদিকে যাও যেন একটি সুসজ্জিত উদ্যান—এই দিক থেকে নূতন দিল্লীও জয়পুরের কাছে হার মানবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, কলকাতা আর ঢাকা ছাড়া এত বড় প্রদেশে তৃতীয় বিস্তৃত শহর আর নেই, কিন্তু পশ্চিমে প্রত্যেকটি শহর বিশাল ও বিরাট। জয়পুর শহর

প্রকাণ্ড। প্রত্যেকটি রাজপথ মসৃণ, প্রশস্ত ও বৃক্ষচ্ছায়াময়। পথগুলি দীর্ঘ, ঋজু। নিকটে পাহাড়ের উপরে মহারাজ অম্বর প্রাসাদের দৃশ্য অতি সুন্দর, দূরে পূর্বদিকে অন্য পাহাড়ে গলতা নামক প্রপাত। দূরে যশোরেশ্বরীর মন্দির এবং শহরের মধ্যস্থলে জয়পুরের বিখ্যাত তীর্থ দেবতার মন্দির—নাম গোবিন্দজী। অনেকে বলে—বৃন্দাবন থেকে একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবার পথে এইখানে আসন পেতেছিলেন। মন্দির শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরময়, অতি সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন,—নাটমন্দির পার হয়ে গেলে কৃষ্ণকায় প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তির দর্শন মেলে। জয়পুরের বাজারে ঢুকলে মনে হয় এক বিশাল দুর্গ প্রাকারে প্রবেশ করছি, তার কত পথ, কত অলি-গলি, কত বর্ণবাহুল্য এবং কত চিত্রলিপি। সেকালে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক সুতরাং শহর নির্মাণের এমন কৌশল ছিল যে শত্রুর আগমনবার্তা পেলেই শহরের সকল প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া সহজ হোতো। যাঁরা এইদিকটা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা বর্তমান নূতন ও পুরাতন দিল্লীর মধ্যবর্তী প্রস্তর-প্রাচীরের কথা স্মরণ করুণ।

আমি আগের আলোচনায় বলেছি আধুনিককালে এক শহর অন্য শহরের অনুকরণ। সুতরাং শহরের সাজসজ্জা অন্য শহরেও যেমন দেখা যায়, জয়পুরেও তার অভাব নেই। তবে জয়পুরের ম্যুজিয়ম পশ্চিম ভারতের তার পুরা-সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি-লাভ করেছে। প্রায় একশত বৎসর হ'তে চললো এই শহরে স্থায়ী বাঙ্গালীর উপনিবেশ হয়েছে। বাঙ্গালার ভূ-সম্পত্তি রাজানুগত্যের চুক্তিতে এই শহর কম নেই। এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার গোড়াতে আমরা স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেনের নাম পাই। তিনি তখনকার মহারাজার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন,—উত্তর পশ্চিম কাশ্মীরে যেমন স্বর্গীয় নিলাম্বর মুখোপাধ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চাকুরে বাঙ্গালী পরিবার অনেকগুলি

জয়পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। জয়পুরের প্রায় সকলেই জানে, প্রায় আড়াইশো বছর আগে এক বাঙালীর পরিকল্পনায় এই শহর নির্মিত হয়েছিল। খাল-বিল-নদী-সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ের প্রাচুর্য থাকার জন্য বাঙ্গালীজাতি স্বভাবকোমল ভাবপ্রবণ এবং কম কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু রাজপুতানায় মেয়েরাও অসাধারণ পরিশ্রমী। তারা শিশুকে কাঁকালে নিয়ে অনেক সময়ে দিনে চারবার বড় বড় দুই গাগরা জল মাথায় নিয়ে তিন মাইল চার মাইল পথ অতিক্রম করে। জলাভাবের দেশে মানুষের শরীর অতি বলিষ্ঠ হয় এই আমার বিশ্বাস। মেয়েরা কেবল রাঁধে না, তারা দোকান করে, ফেরী করে, কুলীর কাজ নেয়। একজন বলিষ্ঠ রাজপুতানী অনেক সময়ে একজন বলিষ্ঠ বাঙ্গালী অপেক্ষাও বলশালিনী। তারা যে একদা বীরপ্রসবিনী ছিল তাদের দেখে একথা বিশ্বাস করা চলে।

আজমীঢ় বাণিজ্য-প্রধান শহর। তুলা, রেশম ও পাথরের কাজ এখানে কম নয়। এই কেন্দ্র থেকে দক্ষিণে ইন্দোর অবধি, পশ্চিমে হায়দরাবাদ ও করাচী, দক্ষিনপশ্চিমে গুজরাট ও পূর্বে আগ্রা সমস্ত দিকেই আমদানী রপ্তানী চলতে পারে। সকল বাণিজ্যই বেশির ভাগ মাড়োয়ারীর অধিকৃত। জয়পুর থেকে আজমীঢ় ষাট মাইল পথ। আজমীঢ় শহর লালরঙে রঙীন। নিকটে আরাবল্লী পাহাড়—যে আরাবল্লী রাজলুতানার ভিতর দিয়ে দিল্লী ভেদ ক'রে চ'লে গেছে—সেই পাহাড়কাটা রাঙা পাথরে আজমীঢ়ের বহু প্রাসাদ নির্মিত এবং সেই সকল নির্মাণকার্য হিন্দুর স্থাপত্য ভাস্কর্যের এক একটি মনোরম নিদর্শন। প্রস্তর প্রাসাদ ও মন্দিরের চিত্রাঙ্কন, কলানৈপুণ্য এবং ভাস্কর্যের পরিচয় পশ্চিমের প্রত্যেক শহরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আজমীঢ় শহর অতিশয় বালুময় এবং বানিজ্য-প্রধান হওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত শ্রীহীন। শহরকে সুসজ্জিত করার চেয়ে বাণিজ্যের

লাভ-খতিয়ানের দিকে স্থানীয় বাসিন্দার আগ্রহ বেশি। শহর থেকে নয় মাইল দূরে আরাবল্লী পাহাড়ের পথে পুষ্করতীর্থে যাওয়া যায়। পুষ্কর ছুষ্কর—যাত্রীরা এই কথা বলে। টঙ্গাগাড়ী যাত্রীদের নিয়ে পাহাড়ের পথ অতিক্রম করে। আশেপাশে পাহাড়ের চেহারা কোথাও রাঙা, কোথাও গৈরিক, কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ। বৃক্ষলতা গুল্মময় সামান্য পরিমাণ পাহাড় পেরিয়ে সমতলে নামলে পুষ্কর সরোবর, নিকটে ক্ষুদ্র বসতি। এই তীর্থ-স্থান গোয়ালীয়র মহারাজার শাসনাধীন। চারিদিকে অজস্র বানর, ময়ুর ও হরিণ। সরোবরে অসংখ্য কুমীর। আশেপাশে কয়েকটি ধর্মশালা। ব্রহ্মার ছুই স্ত্রী—সাবিত্রী ও গায়ত্রী। সাবিত্রীর মন্দির সরোবরের পরপারে পাহাড়ের মাথায়—মরুভূমি অতিক্রম ক'রে সেই পাহাড়ের প্রায় চারশো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মন্দিরের ভিতরে শ্বেত প্রস্তরময়ী দেবীমূর্তি—এবং সেই মন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালে দূরদূরান্ত অবধি ফল জল শস্যহীন রাজ-পুতানার বিশাল মরুময় ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। গায়ত্রী দেবীর মন্দির পুষ্করের লোক-বসতির মধ্যস্থলে। দেবী সাবিত্রীর প্রসাদী সিঁতুর নোয়া হিন্দু মহিলাদের নিকট নাকি তুর্লভ সামগ্রী।

এইবার আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, আজকের বক্তব্য শেষ করব। জয়পুর থেকে আজমীঢ় হয়ে আবু পাহাড়ের স্টেশন মাত্র এক রাত্রির পথ। জ্যোৎস্না রাত্রে যাত্রা করলে রেলপথের তু'ধারে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। মানবসভ্যতার চিহ্নহীন মরুময় দেশে রুক্ষ পাহাড়ের গুহার আশেপাশে ছোট নির্ঝরিণী—তার উপরে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি,—সে অপূর্ব দৃশ্য। তীর্থমন্দিরগুলিতে দেবতারা আছেন কিনা জানিনে, কিন্তু এই দেবভূমি ভারতের সকল পথই তীর্থ পথ, দেবতার প্রসন্নরূপ ভারতের পথে পথে।

আবু রোড স্টেশন খুব ছোট, এখান থেকে মোটরে আঠারো মাইল পাহাড়ের উপর উঠলে তবে আবু পাহাড়ের শহর। যতদূর মনে হয় রাজপুতানায় একটি একমাত্র পাহাড়ী শহর। শহরটি ছোট। পাহাড়ের নীচে অরণ্যপথ। সেই অরণ্যের পশ্চিম সীমানায় একটি ক্ষুদ্র বালুময় নদী—নদীটির নাম বানাস, বর্ষায় একটু জল নামে, অন্য সময়ে শীর্ণ এবং হেঁটে অনেক জায়গায় পার হওয়া যায়। শোনা গেল নদীর পরপারে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি তীর্থমন্দির অবস্থিত। পাহাড়ী শহর অপেক্ষা তীর্থস্থান আমাকে বেশি আকর্ষণ করে—সুতরাং স্টেশন থেকে গরুর গাড়ী নিয়ে সেই দুর্গম অরণ্যের অন্ধকার পথে যাত্রা করা গেল। অনেকে বললে, জন্তু জানোয়রের ভয় আছে। নদী পার হয়ে ছোট ছোট ঝরণা মাড়িয়ে গাড়ী চললো। অরণ্য নির্জন কিন্তু ভয় কোথাও নেই। ক্রোশখানেক পথ পেরিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো মন্দিরের নিকটে। ছায়াবহুল নিভৃত তপোবনে সেই মন্দিরের নাম হৃষিকেশ। সেই অনাড়ম্বর প্রাচীন মন্দিরটি আমার নিকট চিরস্মরণীয় হয়েছে।—

ভগবান বুদ্ধদেব—যিনি শাস্ত্রমতে নবম অবতার তাঁর জন্মস্থান কপিলবস্তু নগরে। এই নগর নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডুর নিকটে। সুতরাং নেপাল যে হিন্দু ও বৌদ্ধের একটি তীর্থস্থান হবে এ বলাই বাহুল্য। একদা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে নেপাল রাজ্যে পৃথিবীর একটি নূতন

সভ্যতাও জন্মগ্রহণ করেছিল,—সেই সভ্যতা আজও অম্লান ও জীবন্ত।

নেপাল রাজ্য বিশাল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত, কিন্তু বৃটিশ ভারতের এলাকার মধ্যে নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন—এই দুই কারণে আমরা মনে করি নেপাল বুঝি ভারতের বাহিরে।

নেপালে সহসা যাওয়া যায় না। নেপাল-রাজসরকারে চাকুরী আছে অথবা কাজ কারবার আছে এমন লোক না হ'লে সেখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা ঘটে। এমনি অবস্থায় একটা সুযোগ পাওয়া গেল। ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীর পর্বে নেপালে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে। অতএব পাকা তীর্থযাত্রীর বেশ ধ'রে পথে বেড়িয়ে পড়া গেল। শিবচতুর্দশীর দিন পশুপতিনাথ দর্শন করলে একেবারে মোক্ষলাভ।

বিহারে মোকামা স্টেশনে নেমে গঙ্গা পার হয়ে গেলে সামরিয়াঘাট স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে উঠলে উত্তর বিহারের পথ। সেটা ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ বিহার ভূমিকম্পের ঠিক এক বছর আগে। পথে মুজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, বরৌণী প্রভৃতি শহর পার হয়ে যেতে হয়। সকাল বেলা গাড়ীতে উঠলে অপরাহ্নে সগৌলী পৌঁছানো যায়। এই সগৌলী কেন্দ্রে ইংরাজ ও নেপালীতে একদা যুদ্ধ বেধেছিল, যুদ্ধের পরে দুইটি শক্তি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তির অন্যতম সর্ত হোলো নেপালে বৃটিশ লিগেশন্ ও নেপালের ডাক ও পররাষ্ট্র বিভাগে বৃটিশের আংশিক কর্তৃত্ব। যাই হোক সগৌলী থেকে গাড়ী সোজা উত্তরে হিমালয়ের অভিমুখে রক্সৌলে এসে সন্ধ্যার সময় পৌঁছয়। রক্সৌল শহর অতি সামান্য, কিন্তু এই শহরের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তার কারণ এই যে, এখানে দুটি রেল-স্টেশন। একটি বৃটিশ এলাকায় ও অপরটি নেপালের এলাকায়। এই দুইটি স্টেশনের সর্বত্র নেপালী ও বৃটিশ ভারতীয় প্রহরী সতর্ক

প্রহরায় অহোরাত্র নিযুক্ত; দুদিক থেকে যাত্রীদের আনাগোনার প্রতি তারা সকল সময় প্রখর দৃষ্টি রাখে। ভারতবর্ষ ও নেপালের সীমারেখার উপর এই ক্ষুদ্র শহরটি সর্বাপেক্ষা সমতল ভূমিতে অবস্থিত এবং সেই কারণে সুগম।

দুইটি স্টেশনের মধ্যস্থলে ছাড়পত্রের দপ্তর। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ছাড়পত্রের জন্য দুটি পয়সা লাগে। তারপর ট্রেনে অর্থাৎ নেপাল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে দিয়ে অমলেকগঞ্জ পর্যন্ত যেতে গাড়ী ভাড়া লাগে চার আনা কিম্বা ছয় আনা। রেলপথটি অতি কৃশ। গাড়ীগুলি ছোট ছোট, এঞ্জিনের গতির অপেক্ষা শব্দই বেশি, এবং অনেক সময় গাড়ী গ্রামের পথ দিয়েই চলে। দুধারের গ্রামগুলি অরণ্যময়। মধ্যপথে সকলের বড় স্টেশন বীরগঞ্জ। এই বীরগঞ্জের দুধারে হিমালয়ের টিরাই অরণ্য। সেই অরণ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, লেপার্ড—প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ। নেপালের মহারাজা অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী অনেক সময় এই পথ দিয়ে শিকারে যান।

অমলেকগঞ্জ স্টেশনে এসে গাড়ী থামল, এবং পরে অসমতল পার্বত্যপথ সুতরাং ট্রেন আর চলে না। যাত্রীরা নেমে সবাই যে যার আশ্রয় খুঁজে নিল। জনতা বেশি হলে আশ্রয়ের অভাব ঘটে, কারণ যাত্রীনিবাসের সংখ্যা বড় কম। সেই রাত্রে আমরা একটা কাঁচামালের আড়তে আশ্রয় নিলাম। বৎসরের সকল সময়েই এদিকে শীতের প্রকোপ বেশি। আশেপাশে হিমালয়ের অরণ্য।

পরদিন প্রভাতে মোটর বাস পাওয়া গেল। সকালের আলোয় দেখলাম ছোট গ্রামে দুটি চারিটি বাড়ী ঘর আর সবই পতিত জমি। আমদানী রপ্তানী ছাড়া এই সকল জায়গার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মোটরবাসে ভীমপেডী পর্যন্ত যেতে বোধ হয়, এক টাকা থেকে দেড় টাকা ভাড়া লাগে।

শিলিগুড়ি থেকে যেমন দার্জিলিং, অথবা কাল্‌কা থেকে যেমন শিমলা—তেমনি অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডী। পথের একদিকে বিশাল পাহাড় অন্যদিকে বাগমতী নদী। এই বাগমতী নদী শুনেছি তিস্তা নদীতে গিয়ে মিলেছে। কিন্তু পথ অতি সুন্দর, ভারতবর্ষের পার্বত্যপথগুলির মধ্যে এমন মনোরম ভ্রমণের আনন্দ অন্য কোন দেশে বিরল। মাঝে মাঝে পথ রাঙা, বসন্তকালের ঝরা পাতায় ছাওয়া, কোথাও কোথাও ঝরণার ঝরো ঝরো শব্দ। প্রভাতে পাখীর দল পাইন আর ঝাউয়ের বনে কলকুজনে মত্ত; পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট গ্রাম।

চব্বিশ মাইল পথ অতি আনন্দে পার হয়ে আমরা ভীমপেডীতে এসে পৌঁছলাম। এখান খেকে কাটমাণ্ডু শহর আন্দাজ কুড়ি মাইল। এই কুড়ি মাইল পথ অতি দুর্গম। এই পথে জলাশয়, খাদ্য বস্তু ও আশ্রয়ের একান্ত অভাব, সেই কারণে যাত্রীরা ভীমপেডীতে স্নানাহার ও বিশ্রাম ক'রে নিয়ে যাত্রা করে। পাহাড়ীরা স্বভাবত কঠিন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত, সেই কারণে তাদের গায়ে এই সব শারীরিক শ্রম ও রুচিকর খাদ্যের অভাব লাগে না। পথ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাবশত ভীমপেডীতে আমরা অপেক্ষা না ক'রে অগ্রসর হ'য়ে চললাম। চললাম উত্তর দিকে। সম্মুখে দুরারোহ দুর্গম কঠিন পর্বত, এই পর্বত আমাদের হেঁটে পার হতে হবে। মনে অহঙ্কার ছিল, পর্বত আরোহণে আমি অতি সুপটু কিন্তু ঘণ্টা খানেক চড়াই উঠে চারিদিকে অকূল দেখলাম। পরেশনাথ পাহাড়ের যে চড়াই তার চারিদিকে স্নিগ্ধ অরণ্যছায়া আছে, এমন দেখেছি সেখানে অনেক সময়ে কৌতুহল-বোধ জাগ্রত থাকে কিন্তু এই পথ আমাকে বদরিকাশ্রমের ছান্তিখাল চড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। রৌদ্র প্রখর, ছায়া নেই, পানীয় জলের চিহ্ন কোথাও দেখিনে, চটি নেই, পথের আন্দাজ পাইনে—অথচ আবার ভীপেডীতে ফিরে

যাওয়াও অসম্ভব। অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত অবস্থায় আমাদের পাহাড় ভেঙেই এগিয়ে যেতে হোলো।

এই পাহাড়ের নাম সিসাগড়ি, হয়ত নামটা শ্রীশগিরির অপভ্রংশ। পাহাড়ের অনেক অংশে নেপাল সরকারের গোরা ছাউনী আছে, তারা দুর্গম পর্বতের কোণে কোণে বহিঃশত্রুর প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। তিব্বত, চীন, এখান থেকে দূর নয়। একটা গোরা ছাউনীর ধারে এসে আমরা স্নান করবার সুযোগ পেলাম কিন্তু নিকটবর্ত্তী দু'একটা দোকানে বাঙালী রসনার উপযুক্ত খাদ্য না পাওয়ার জন্য নিরাশ হয়ে আমাদের ফিরে যেতে হোলো।

অপরাহ্ণ কালে আমরা বহুপ্রত্যাশিত কুলেখানি ধর্মশালায় এসে পৌঁছলাম। সাত আট মাইল মাত্র পাহাড় অতিক্রম করেছি কিন্তু ক্লান্তি এতই বেশি যে, আমরা কুলেখানিতে পৌছে একেবারে অনড় হয়ে পড়লাম। এখানে প্রকাণ্ড একটা যাত্রীনিবাস। নিকটে ছোট একটি নেপালী গ্রাম—শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্যে যে সব যাত্রীরা আসে তাদের নিয়েই প্রধানত এখানকার কাজ-কারবার। মালপত্র আহার্য প্রভৃতি বস্তু যা কিছু এদিকে মেলে সেসব পাহাড়ের ropeway অর্থাৎ রজ্জুপথ দিয়েই আমদানি হয়ে থাকে। আমদানি-রপ্তানির সহজ উপায় আর কিছু দেখা গেল না। পাহাড়ের মাথায় মাথায় রজ্জুপথ আমরা আগেই আমাদের আসার পথে লক্ষ্য করে এসেছি। দুর্গম পার্বত্য দেশে এই রজ্জুপথ পাহাড়ীদের জীবনযাত্রাকে অনেকটা সহজ ও সাচ্ছন্দ্যময় করেছে বলতে হবে।

শীতপ্রধান দেশে মাটি আর পাথর অপেক্ষা কাঠের তৈরী বাড়ী ঘর বেশি দেখা যায়। একখানা সাধারণ বাড়ীতে কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের অন্যান্য আসবাব আমরা দেখতে পাই। অরণ্যবহুল পার্বত্য শহরগুলিতে এদের সংখ্যা অনেক

বেশি। কুলেখানির ধর্মশালার অনেক অংশ কাঠের তৈরী—কাঠের কাজের জন্য ঠাণ্ডা থেকে অনেকটা আত্মরক্ষা করা যায়। যারা হিমালয়ের শহরগুলিতে ভ্রমণ করেছেন—অর্থাৎ কালিম্পঙ, দার্জিলিঙ, কাটমাণ্ডু, নৈনিতাল, আলমোড়া, শিমলা, কো-মারী প্রভৃতি—তাঁর আমার কথা উপলব্ধি করবেন।

কুলেখানিতে এসে নেপালের আর এক পরিচয় পাওয়া গেল, সেটি নেপালের চারুশিল্পকলার বৈচিত্র্য। মঙ্গোলীয়ান্ টাইপ থেকে যে সকল মানব গোষ্ঠি উৎপন্ন—যেমন জাপানী, চীনা, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি—তাদের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে অতি সুপরিচিত। জাপানী ও চীনা শিল্পকলার যে সকল বিখ্যাত আঙ্গিক পদ্ধতির সঙ্গে শিল্প রসিকগণ পরিচিত, তারই সুস্পষ্ট চিহ্ন কুলেখানির ধর্মশালার গঠন ভঙ্গী ও পারিপাট্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কাঠঘোদাইয়ের সেই বৈচিত্র্য, সেই অলঙ্কার, সেই চিত্রাবলী। নেপালীরা শক্তির পূজারী, সেইজন্য মানব জীবনের আদিম বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে তার মূল্য নিরূপণ করতে তারা ভয় পায় না। যে বিপুল অগ্নিকুণ্ড থেকে মানুষের জন্ম অবিরাম বিচ্ছুরিত হচ্ছে নেপালীরা সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। সেইজন্য পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরগাত্রে যে সকল চিত্র অথবা কাশীতে নেপালী মন্দিরে যে সকল চিত্র খোদিত, সেই সকল চিত্র অসংখ্য পরিমাণে সমগ্র নেপালের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে।

কুলেখানিতে রাত্রিযাপনের বিশেষ অসুবিধা হোলো না। আহার্য বস্তু কিনতে পাওয়া গেল। নেপালী মুদ্রাগুলি বৃটিশ ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে এখানে চলে। যতদূর আমাদের মনে আছে আমাদের দশ আনায় ওদের একটাকা হয়।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম। পথ উঁচু বটে কিন্তু অনেকটা সমতল। দুই ধারে যতদূর দৃষ্টি চলে পর্বতের পর

পর্বত। আমরা চেৎলাঙের দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে চড়াই, মাঝে মাঝে উৎরাই। পথে নদী পার হয়ে আবার চড়াই উঠতে হয়। শিবরাত্রির তখনও দুইদিন দেরি, সেজন্য তাড়া নেই। মধ্যাহ্নের পরে অনেকটা দুর্গম পথ পার হয়ে আমরা চেৎলাঙ ধর্মশালায় এসে পৌঁছলাম। যাত্রীর জনতা অনেকটা বেড়ে গেছে, আগেভাগে যারা এসেছিল তারা জায়গা দখল করার জন্য আমরা নদীর তটে এক তাঁবুতে আশ্রয় পেলাম। দেখতে দেখতে শীতকালের অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল। সেই হিমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা নদীর তটে ব'সে কাঁপতে লাগলুম। অজানা অচেনা সেই দুর্গম দেশের এক তুহিন শীতল নদীর তটে একটি দরিদ্র তাঁবুর মধ্যে আমাদের সেই রাত্রিটি স্মরণীয়। চতুর্দিকে অন্ধকার, আলোর ব্যবস্থা কোথাও নেই, কেবল কোথাও কোথাও শীতার্ত যাত্রী অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে উত্তাপ সেবন করছে, সেই আগুনের আভায় হাতড়ে হাতড়ে সকলের চলাফেরা। এবং সেই অবস্থাতেও হাস্যকর উপায়ে চাউল ফুটিয়ে নিজেদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করলুম। এর পরে নদীর পাথর কুচির উপরে একখানি মাত্র কম্বল সম্বল ক'রে সেই তুষার শীতল রাত্রিযাপন।

দুঃখের রাত দীর্ঘ হয়, তবু সকাল হোলো। সকালবেলা যাত্রা ক'রে দেখি সম্মুখে বিশাল খাড়াই পর্বত—অনেকটা দেয়ালের মতো। সেই দেয়ালের গা বেয়ে পিপিলিকার সারির মতো যাত্রীব দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। সকলের মুখেই—'জয় বাবা পশুপতিনাথ।' আমরাও তাদের অনুসরণ করলাম। এই পাহাড়টির নাম চন্দ্রাগড়ি বোধ করি চন্দ্রগিরির অপভ্রংশ। চারিদিকে অরণ্যময়। সেই উত্তুঙ্গ চড়াইপথে কোথাও বিশ্রামের অবকাশ নেই, পথ প্রস্তরময়। একশো গজ উঠতে পনেরো মিনিট লেগে যায়। সকলেই ক্লান্ত, সকলেরই দম

ফুরিয়ে যায়। এইভাবে প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর আমরা চন্দ্রগিরির চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। নেপাপের যিনি মহারাজা তাঁকেও ডাণ্ডিতে এই পথ পার হতে হয়—এইটুকু কেবল আমাদের সান্ত্বনা।

চূড়ায় উঠে অপরদিকের নীচে চেয়ে দেখি, দূরে স্বপ্নপুরীর মতো কাটমুণ্ডু শহর চিকচিক করছে, আর তারই চারিদিকে চিরতুষারময় হিমাচল সূর্যের কিরণে জাজ্বল্যমান। আমরা তখন কমবেশি পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা চূড়া থেকে নামতে লাগলাম। আমাদের পথের পাশে অরণ্যময় গভীর খদ, সাবধানে নামতে হচ্ছে। এত রৌদ্রেও নীচের দিকে অন্ধকার। পাহড়ের মাথার উপর দিয়ে রজ্জুপথে দূর শহরে মাল আমদানি রপ্তানি চলেছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা লাগলো নীচে নামতে। প্রথম যে শহর পাওয়া গেল তার নাম থানকোট, ধূলো বালিতে আচ্ছন্ন। থানকোট থেকে কাটামাণ্ডু ছ'মাইল। অনেকেই হেঁটে যায়, কিন্তু আমরা গেলাম মোটর বাসে। পথ সমতল বটে কিন্তু বড় কর্কশ। যান বাহনের চলাচলের ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনেক ত্রুটি দেখা গেল।

কাটমাণ্ডু পৌঁছবার আগে বাঘমতি নদীর পুল পার হতে হয়। মধ্যাহ্নকালে আমরা রাজধানীতে এসে পৌঁছলাম। শহরের নোংরা ও ঘিঞ্জি চেহারা প্রথমে দেখলে মন বিষণ্ণ হয়। অনেক বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে চোখ পড়তে অস্বাস্থ্যকর মনে হতে লাগলো। শোনা গেল শহরের যারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তারা বেশিরভাগ নানারোগে জীর্ণ। যাই হোক, ত্রিপুরেশ্বর মন্দিরের কাছে এসে আমাদের মোটর দাঁড়ালো। পথের মাঝখানে অনেক জায়গায় সিঁদুর মাখা শিবলিঙ্গ চোখে পড়লো, কোথাও কোথাও পথে হাঁড়িকাঠে পশু বলি দেওয়া হয়েছে তারও রক্তের দাগ। শহরের গঠন সৌষ্ঠবের

মধ্যে শৃঙ্খলার চেহারা দেখতে না পেলে আমাদের আধুনিক মন একটু পীড়াবোধ করে বৈকি। তীর্থস্থানে এসে পৌঁছে প্রাণে আনন্দ হোলো, কিন্তু মন খুশি হোলো না।

একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের বাড়িতে আতিথ্য নেওয়া গেল। পরিচিত মানুষের মতো তিনি যত্ন ক'রে তুলে নিলেন।

আমাদের বাসাটা হোলো সিভিল্ লাইনে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পল্লীর ধারে। হাসপাতাল, স্কুল, ময়দান, কলেজ, প্রধান সেনানায়কদের প্রাসাদ—সবই কাছাকাছি। সম্মুখে পথের ধারে পূর্ব মহারাজা চন্দ্র শমসের জঙ্গ বাহাদুরের একটি প্রস্তরমূর্তি। নিকটে ময়দানে প্রায়ই নেপালী সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখা যায়। পূর্বদিকে একটি প্রকাণ্ড সরোবর —কলকাতার লালদীঘির মতো। নাম রাণীবাগ। সরোবরের মাঝখানে একটি সুন্দর মন্দির। তার তীরে একটি ঘড়ি। এই মন্দির আর ঘড়ি যাত্রীদের অমৃতশহরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শহরের এই দিকটা একটু পরিচ্ছন্ন বটে। টাওয়ার ঘড়িটির আওয়াজ মাইল তিনেক দূর থেকেও শোনা যায়।

চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর, মাঝখানে কাটমাণ্ডু শহর, সেজন্য শহরের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। রোদ না উঠলেই ভিজে স্যাঁতস্যাত করে, মানুষের শরীর খারাপ হয়। নেপালীরা দরিদ্র, তাদের শিক্ষার প্রসারও তেমন নয়। দেশের যিনি রাজা তিনি অনেকটা দেবতারই মতো, অর্থাৎ নিজের মন্দিরেই তিনি অধিষ্ঠিত, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বড় কম। তিনি আপন রাজ্য ছেড়ে দুনিয়ায় কোথাও যান না, তার কারণ, নেপালীদের বিশ্বাস, রাজা দেশ ছেড়ে গেলেই রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল। দেশ যিনি শাসন করেন তিনি সপারিষদ মহারাজা নিজে, তিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছায় রাজ্যের ভালোমন্দ। যিনি রাজা তিনি ধীরাজ নামে

পরিচিত। বর্তমানে যিনি মহারাজা তাঁর নাম যোদ্ধশমসের জঙ্গ বাহাদুর, তিনি 'পাঁচ-সরকার' এই নামে চলেন। যিনি রাজাধীরাজ, তিনি হলেন 'তিন সরকার।' ধীরাজ ও মহারাজা সম্বন্ধে সম্ভব ও অসম্ভব জনশ্রুতি শোনা গেল, অনেক সময়ে সেগুলি ভীতিজনক, অনেক সময় শ্রদ্ধেয়, তবে একটি কথা আমি আজো মনে রেখেছি যে, দেশবাসীর বহুতর অভাব ও অভিযোগের সকল রকম প্রতিকারের ক্ষমতা রাজসরকারের হাতে নেই, অনেক সময়ে তাদের ইংরেজের দিকে চেয়ে থাকতে হয়।

নেপালে কেটি শব্দটার খুব প্রচলন। এই শব্দের প্রচলিত অর্থ দাসী বা বাঁদি। সেই অর্থে কেটা মানে চাকর। নেপালে এমন বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন যাঁরা বাড়ীর কন্যাকে রাজ প্রাসাদের কেটির পদমর্যাদা দিতে চান। ধীরাজ ও মহারাজার প্রাসাদে এইভাবে শত শত কেটি প্রতিপালিত হয়। কেটিরা ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকতে পায়, এবং নিজ নিজ মাসোহারা থেকে পিতামাতা অথবা আত্মীয়কে সাহায্য করতে পারে। যারা কেটির সন্তান তারা অনেক সময়ে জায়গা জমি ধনদৌলতও পায়—সেটা অবশ্য পৈতৃক পরিচয়ের স্বযোগে।

নেপালের মুদ্রাগুলি ভারি কৌতুকপ্রদ। এক-আধলা, দু-আধলা ও মোহর। তামারগুলি সুশ্রী ও সমান-গঠনের নয়, মোহরগুলি রৌপ্য, একটি মোহরের দাম আমাদের শওয়া ছ' আনা। নেপালের ডাকবিভাগ—স্বদেশ ও বিদেশ—সমস্তই বৃটিশ লিগেশনের হাতে। তাদের পররাষ্ট্রনীতি ইংরেজের সহযোগিতার পথ ধ'রে চলে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য নেপালীরা বাঙ্গালীর কাছে কিছু পরিমাণে ঋণী বৈকি। স্কুলে, কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী চাকুরীতে, হাসপাতালে, পুর্তবিভাগে, বিচারালয়ে—সকল স্থানেই এই সেদিন পর্যন্ত বাঙালীরাই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত

ছিল। আজো রাজবাড়ীতে ও মহারাজের পরিবারে গৃহ শিক্ষক, কেরানি ও চিকিৎসক বাঙ্গালী। অন্যান্য সরকারি চাকুরী বলতে ওখানে সৈন্য বিভাগকেই বোঝায়, এবং যে কোন গৃহস্থ ঘরের যুবক সৈন্যবিভাগে চাকুরী নেবার জন্য উৎসুক। সম্প্রতি কাটমাণ্ডু শহর থেকে দূরে দারাগাঁও নামক পর্বতের উপরে একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সার্ভেয়ার ও পরিদর্শক একটি বাঙ্গালী নিযুক্ত ছিলেন।

নেপালের সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী। বহির্জগতের প্রবহমান চিন্তার ধারা মনে হয় আজো নেপালে পৌঁছয়নি। প্রাচীনপন্থীর সকলের বড় অভিশাপ হোলো রক্ষণশীলতা। সেইজন্য বর্তমানকালের যে সকল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পৃথিবীর সকল দেশে এমন কি ভারতবর্ষে ও বিকীর্ণ হয়েছে সেই আলো এখনো এই পার্বত্য জাতির অন্দরে এসে পৌঁছয়নি। তাদের ধর্ম বুদ্ধিতে, আচার আচরণে, সমাজবিধিতে, শিক্ষায়তনে, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় উদার আদর্শের অভাব লক্ষ্য করেছি। আমার এই মন্তব্যের সর্বপ্রধান প্রমান হোলো যে, ব্যাধি ও অস্বাস্থ্যে এমন সুন্দর পার্বত্য শহরটির বাতাস ভারাক্রান্ত। গরম জল ছাড়া আর কোনরূপ জল ব্যবহার করা এখানে বিপজ্জনক।

একদা বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের উত্তরভাগে হিমালয় পর্বতে নেপাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল, দার্জিলিং ছিল একদা নেপালের অন্তর্গত। আজ সেই বিস্তৃত রাজ্যের বহু অংশ উপেক্ষিত ও বিরল বসতি। কোথাও পর্বতের দুর্গমতা, কোথাও চিরস্থায়ী তুষারের স্তূপ, কোথাও বা ভীষণ তুষারগলিত জলপ্রপাত। তবু এদের মধ্যেও ছোট ছোট গ্রাম, ছোট ছোট শহর আমরা দেখতে পাই। যে সকল গ্রাম ও শহরগুলির অধিকতর খ্যাতি আছে তাদের মধ্যে পাটান্, স্বয়ম্ভু, দত্তাত্রেয়, দক্ষিণকালী, নারায়ণথান, চৌবাহার

কীর্তিপুর ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব গ্রাম ও শহর অবশ্য কাটমাণ্ডুর কাছাকাছি অবস্থিত। অনেক গ্রামে মানুষের মধ্যযুগের জীবন যাত্রার বিস্ময়কর পদ্ধতি দেখা যায়—নেপালের বাহিরে অথবা হিমালয় পর্বত ভিন্ন যে আর কোথাও কোনো জগৎ আছে এ তাদের জানা নেই।

ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান নেপাল হলেও বৌদ্ধধর্ম নেপালে পরিচিত হয়েছিল অনেক পরে, বুদ্ধদেবের মন্ত্র যতদূর মনে হয় উত্তর ভারতের সমতল ভূভাগে আগে প্রসারিত হয়েছিল। আজো পাল পার্বণে উৎসবাদিতে নেপালে অনার্য জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কাটমাণ্ডু শহর থেকে পূর্বদিকে তিন মাইল দূরে হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থ পশুপতিনাথের প্রস্তর মন্দির অবস্থিত। শহর থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। বৎসরে কেবলমাত্র এই শিব চতুর্দশীর সময়েই ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়ে থাকে। যারা আসে তারা মাস খানেক পর্যন্ত নেপালে বাস করার হুকুম পায় - যতদূর আমি শুনেছি। শিব-রাত্রির মেলা এখানে বিখ্যাত। সমগ্র ভারতের একান্ন পীঠের মধ্যে এটিও একটি পীঠস্থান—পীঠস্থানে গুহ্যেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পশুপতিনাথের মূল মন্দির ছাড়াও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির দেখা যায়। মূল মন্দির বিশাল সোনার পাতে মোড়া, রূপার তোরণ, ভিতরে মহাদেবের কৃষ্ণকায় প্রতিমূর্তি, মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড এক কণককান্তি বলিবর্দ। এই বিশাল মন্দিরের নীচেই শীর্ণকায়া বাগমতী নদী। যারা তীর্থযাত্রী তাদের জন্য পশুপতিনাথ গ্রামে কতকগুলি যাত্রীশালা আছে, কাটমাণ্ডুতে থাকা যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধাজনক। এখানকার মেলা উপলক্ষ্যে শিবচতুর্দশীর দিনে নানারকম শোভাযাত্রা দেখা যায়। রাজপুরুষগণ অনেকেই এই শোভা-

যাত্রায় যোগদান করে থাকেন। দেশটা প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ নয়।

বর্তমানে যিনি নেপালের রাজসম্রাট অর্থাৎ ধীরাজ তাঁর নাম আমি জানিনে তবে তাঁকে দেখেছি। তাঁর বয়স অল্প এবং প্রিয়দর্শন, তাকে দেখে একজন বাঙালী যুবক বলে মনে হয়। তাঁকে দেখে আমার এই কথাটা মনে হলো রাজ্যের রাজা যিনি, তিনি একটি সামান্য প্রচলিত সংস্কারের অধীন! নেপালের বাইরে পা বাড়াবার অধিকার তাঁর নেই!

নেপালের যেটি রাষ্ট্রভাষা সেটি সংস্কৃত ও দেবনাগরী মিশ্রিত। ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা সেখানে অল্প। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সাধারণ লোকে ইংরেজী শেখে না। দেশী ব্যবসার প্রচলন বেশ আছে। সরকারী দপ্তরে যে সকল কাগজ পত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নেপালেই প্রায় তৈরী। বিদেশী পণ্যের চাহিদা অল্পই। নেপালে গ্রীষ্মকাল বলে কোন ঋতু নেই শীত কম এবং শীত বেশি এই মাত্র।

রাজার ছেলে নেপালে রাজা হয় কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কে নিয়ম অন্যরূপ। প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ মহারাজার মৃত্যু ঘটলে তাঁর ভাই হবেন মহারাজা। ভাই না থাকলে ভ্রাতুষ্পুত্র। এই নিয়ে রাজ্যে অনেক সময়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কিছুকাল আগে এমনি একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। একদা অকস্মাৎ কয়েকজন রাজপুরুষের জটিল জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ হয়ে পড়ায় মহারাজা একদিনের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে বরখাস্ত করেন। যারা রাজ্যের হর্তাকর্তা হবে মনে করেছিল আজ তারা অনেকেই সামান্য মাসোহারায় নিভৃত জীবন যাপন করছে। শোনা গিয়েছিল রাজপুরুষগণের উত্তরাধিকার সূত্রকে নির্মল করবার জন্যই মহারাজা এই বেপরোয়া বিধান প্রয়োগ

করেছেন। এই বিপর্যয়ের ভিতরকার ইতিহাস রহস্যময় রয়ে গেল।

আন্দাজ এক সপ্তাহ কাটমাণ্ডুতে আমি বাস করেছিলাম। তারপর একদিন শয্যাগত অবস্থায় চারিটি লোকে আমাকে ঝাঁপানে তুলে থান্‌কোট থেকে ভীমপেডী পর্যন্ত প্রায় কুড়ি মাইল পথ বহন করে আনে। পুনরায় হেঁটে ফিরতে হয়নি এজন্য আনন্দ বোধ করেছি। এইভাবে আমার নেপাল ও পশুপতিনাথ যাত্রা শেষ হয়।

বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবী একদিন তরল অবস্থায় ছিল। মহাসূর্যের চারিদিকে তাকে বাধ্য হয়ে ঘুরতে হোতো বটে, তবে তার স্বরূপটি ছিল অগ্নিময়। যাকে বলে, তরল নরম আগুনের একটি মস্ত গোলক। একদিন সৌরলোকের নিয়মে হঠাৎ পৃথিবীর গায়ে কেমন ক'রে যেন ঠাণ্ডা লেগে যায়। ফলে, পৃথিবীর ওপর ভাগটা শক্ত হয়ে জমে ওঠে, এবং ভিতরের অংশে আগুন আর উত্তাপ থেকে যায়। আমরা যাকে আগ্নেয়গিরি বলি, কিম্বা, যেখানকার মাটির তলা থেকে উত্তপ্ত জলস্রোত অথবা অগ্নিময় পদার্থ বেরিয়ে আসে—সে সমস্ত হোলো পৃথিবীর তলাকার সেই সব আগুনের স্ফুলিঙ্গ। যাঁরা ভূতত্ত্ববিদ্ তাঁরা বলেন, আমাদের সমগ্র মানব সভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মিহি আচ্ছাদনের ওপর। অর্থাৎ যদি কোনদিন কোনো কারণে প্রাকৃতিক অবস্থার কোনো আকস্মিক ব্যতিক্রম ঘটে, তবে

আর আমাদের রক্ষা নেই, সমগ্র জীবজগৎ পলকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই, আমরা কোনোমতে ভয়ে ভয়ে পৃথিবীর গায়ে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সঙ্গে পাশাপাশি বাসা বেঁধে আছি। টগবগে গরম দুধের উপরে সর পড়েছে,—সেই সরটুকুর উপরে দাপাদাপি ক'রে আধুনিক সভ্যতা স্পর্ধা প্রকাশ করছে। পৃথিবীর ভিত্তি বড় দুর্বল।

আমরা যাকে পাহাড় পর্বত বলি, সেটি আর কিছু নয়—ওই দুধের সরের উপরকার উঁচুনীচু ভাবটুকু। কত শত লক্ষ বছর আগে বলা কঠিন—সেই থেকে পাহাড়ের দল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাষ্পোচ্ছ্বাসের গতিবেগের গুণে কোনো পাহাড় হয়েছে উঁচু, কোনোটা বা নীচু। তবে একটি কথা বলা যায় এই, পৃথিবীর মাঝামাঝি থেকে উত্তর দিকেই পার্বত্যলোক প্রসারিত,—অবশ্য এটি মোটামুটি হিসাব, কেননা এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া গেছে। ছোট বড় ছয়টি মহাদেশে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হোল এশিয়া মহাদেশ। পৃথিবীর নিজের নিয়মে তার মধ্য অংশটা হোলো সূর্যের কাছাকাছি, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণভাগ হোলো সূর্য থেকে কিছু দূরে। সেজন্য মধ্য লোকের উত্তাপ বেশী, এবং উত্তর ও দক্ষিণ লোকে ঠাণ্ডা প্রচুর। কিন্তু পার্বত্যলোক মাঝপথেই বেশী পরিমাণে রয়েছে। ইউরোপের আল্‌পাইন্ বেল্ট্ অথবা এশিয়ার হিমালয়ান্ বেল্ট্ পৃথিবীর মাঝামাঝি অংশেই দেখতে পাই। সূর্যের উত্তাপের সঙ্গে পর্বতমালার স্নিগ্ধতা, এই দুইয়ে মিলে মানবগোষ্ঠীর সভ্যতা পৃথিবীর মাঝামাঝি অংশেই গ'ড়ে উঠেছে আমরা দেখতে পাই। তুষারলোকে অথবা মরুভূমিতে মানুষের বাসা দেখতে পাওয়া যায় কম।

এশিয়ার সমস্ত পর্বতমালার মধ্যে হিমালয়ের স্থান সবচেয়ে

বড়। কেননা হিমালয়ের পরিক্রমা পশ্চিম দিকে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যেমন প্রসারিত, তেমনি পূর্বদিকে তিব্বত ও চীনদেশেও সুবিস্তৃত। এবং উভয় দিকের সমস্ত পর্বতগুলির নামে বিভিন্নতা থাকলেও আদিজনক হিসাবে হিমালয় হোলো সর্বপ্রধান। এই প্রকার বিস্তারের মোটামুটি চেহারা হোলো চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার মাইল অবধি ব্যাপক। হিমালয়ের কথাই ধরা যাক্। আমাদের ভারত বর্ষের শীর্ষস্থানে এই বিরাট পর্বতমালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এর অবস্থিতি যদি দক্ষিণ ভারতে হোতো, তবে কিছুতেই ভারতকে ঐশ্বর্যশালী দেখা যেতোনা। বায়ুর গতিতে একটি নিজস্ব ভূতাত্বিক নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়মে দেশকে উর্বর করে, অরণ্য সৃষ্টি করে, বর্ষণ আনে, এবং শস্যবীজকে সার্থক করে। ভারতের আকাশে বাতাসে অরণ্যে পর্বতে নদীতে সমুদ্রে এমন একটি ভূতাত্বিক নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়মকে অনুকূল বাতাস এমন সহায়তা করে যে, সমগ্র দেশ সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে ভরে উঠে! আমরা যে ভারতকে দেবভূমি বলি, সে কেবল এই কারণে যে, অরণ্যে পর্বতে বায়ুতে সমুদ্র বাষ্পেতে এই ভারতে এমন একটি প্রাকৃতিক সুষমা ও সম্মেলন ঘটেছে যেটিকে অনেকটা দৈব বলা যেতে পারে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে সহসা এমন দৈবসংযোগ ও প্রাকৃতিক ঐক্য দেখা যায় না। ভারতের লোকেরা এই জল বাতাস আর প্রাকৃতিক ঐক্যের মধ্যে মানুষ, সুতরাং তাদের স্বভাবের মধ্যেও দেখি সর্বমানবিক ঐক্যবোধ, অন্তরের উদারতা।

পর্বত কেবলমাত্র পর্বত নয়, দেশের ঐশ্বর্যও বটে। যে বাষ্প তৈরী হয়ে আসে সমুদ্রলোক থেকে, হিমালয়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষে বৃষ্টিধারা নামে, অথবা অরণ্যলোকের ঠাণ্ডায় সেই বাষ্পময় মেঘ গ'লে গিয়ে ঝরে পড়ে। বঙ্গদেশ ও আসামের ভৌগোলিক অবস্থা বিচার করলে আমরা এটি বুঝতে পারি। হিমালয়ের কৃপায়

আমরা পানীয় জল পাই, আমাদের মাটি সঞ্জীবিত হয়। হিমালয়ের লক্ষ লক্ষ ঔষধিলতা আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনাবিষ্কৃত রয়েছে, একদিন মৃতসঞ্জীবনী সুধা এই হিমালয় থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে,—রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই। সামান্য শিলাজতু আবিষ্কার ক'রেই আমরা দেখেছি মানুষের প্রাণশক্তি ও পরমায়ুকে বাড়ানো যায়। হিমালয়ের পাথরে, মাটীতে, পাতায়—এমন বহুপ্রকার কষ এবং রস পাওয়া যেতে পারে, যার গুণাগুণ বিচার করার জন্য একদল ঔষধতত্ত্ববিদ্ জীবনব্যাপী সাধনা করতে পারেন। নানা অঞ্চলে এমন সব আশ্চর্য রকমের ফোয়ারা আছে, এমন বিচিত্র নির্ঝরের খোঁজ পাওয়া যায়—যার ব্যবহারে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক মিলে যায়।

একথা মনে করা চলবেনা যে, পাহাড়ে মানুষের স্থায়ী বাসা নাই। আমি নিজে দেখেছি সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় দশ বার হাজার ফুট উঁচুতে মানুষ বাসা বেঁধে রয়েছে। তারা গরম দেশে আসেনা, এলেই অপমৃত্যু ঘটে। গাড়োয়াল জেলা অত উঁচু নয়, তবু সেখানকার লোক বাঙ্গলা দেশে এসে বসবাস করতে নারাজ। শীতের কাঠিন্য তারা সয়, কিন্তু গরমের বিগলিত অবস্থা তাদের অসহ্য।

নদী প্রধানত পুষ্ট হয় পর্বতে। সেজন্য নদীর অপর নাম পার্বতী। পর্বত হোলো মানুষের কল্যাণের প্রতীক সুতরাং তাকে আমরা বলছি শিব। শিবের জটা থেকে গঙ্গার উৎপত্তি, অর্থাৎ নদীর প্রবাহে মানুষের কল্যাণ নিহিত। হিমালয় না থাকলে গাঙ্গেয় ভূভাগ হোতো মরুভূমি। যে-নদীর আদিতে পর্বত নেই, সেই নদী শুকিয়ে মরে। সেই কারণে যে পার্বতী নদী নিত্য-প্রবহমানা, তারই তীরে তীরে মানব সভ্যতার সাধনা ব'সে গেছে।

আমাদের স্বাধীনতা এসেছে বহুকাল পরে। এই সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে! এবার যদি বিশেষজ্ঞের দল পর্বতে, অরণ্যে এবং সমুদ্রের দিকে অভিযান করেন, তবে নতুন জীবন খুঁজে পাবেন। বিশেষ ক'রে পর্বতমালার দিকে। কেননা পার্বত্যসম্পদ অফুরন্ত। কত রত্নের খনি, কত অনাবিষ্কৃত ঐশ্বর্য, কী বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার রয়ে গেছে পর্বতে! এতদিন আমরা সমতল ভূভাগে বিচরণ করে ধনসম্পদ আহরণ করেছি, এবার আমাদের চোখ পড়ুক পর্বত আর অরণ্যের দিকে,—আমাদের দেশের ও জীবনের সকল দারিদ্র্য ঘুচে যাক্।

হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ ও বিস্ময়টাই আমার কাছে প্রধান, বিবরণের হিসাবনিকাশটা সামান্য। আমি পরিব্রাজক, সাংবাদিক নই, সুতরাং তথ্যের দিক থেকে কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে। আমার এই মনোভাব আমি 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামক বই খানাতেও প্রকাশ করেছি।

মহাযোগীর যে বিরাট ধ্যানগম্ভীর মূর্তি তার বর্ণনা সকল ভাষার অতীত, মানুষের সকল কল্পনা, তাঁর পদপ্রান্তে স্তব্ধ। বাস্তবিক এত বড় বিস্ময় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। একদিকে চিরদুর্গম তুষারের স্তর, গর্জায়মান ভীষণ জলপ্রপাত, মানুষের অগম্য গহন অরণ্যানী, অন্যদিকে প্রকৃতির আশ্চর্য লীলাবৈচিত্র্য,—প্রচণ্ড শীলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত, বায়ুবেগ ও পর্বতবিদারণ, অশ্রান্ত তুষারপতন, শীতঋতুর ভয়াবহ রূপ।

উচ্চতাভেদে হিমালয়ের ঋতু পরিবর্তন ঘটে। উপত্যকা ও অধিত্যকার রূপলাবণ্য পরিব্রাজকের হৃদয়কে আনন্দে অভিভূত করে। কোথাও কোথাও চিরবসন্তময় শ্যামশ্রীর কমনীয়তা, গোলাপ-মল্লিকা-যূথী-মালতীর অনন্ত সমারোহ, শ্রান্তিহীন পাখীর কলকূজন, দ্রুতগামিনী স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী, অরণ্য ওষধিলতার নিবিড় কানন,—তারই উপরে অলস রৌদ্র এবং তন্দ্রাজড়ানো মধুর বাতাস পত্রপল্লবের উপর দিয়ে ক্লান্তিহীন অঞ্চল বুলিয়ে চলেছে। পৌরাণিক প্রাচীনকালের বহু উপাখ্যান হিমালয়ের স্তবকে স্তবকে প্রচলিত। পর্বতের শিখরে শিখরে বহু প্রাচীন দেবালয়, হিন্দুর অগণা তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক রাজণ্যবর্গের নানা বিচিত্র কীর্তি।

হিন্দুস্থানের সমতলভূমি থেকে হিমালয়ের যে বাহ্যরূপ, মনে হয় নিমীলিতনেত্র এক মহাতপস্বী চিরতপস্যায় আসীন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করো, সেখানে প্রাণের বিচিত্র স্পন্দন। নদীর তীরে তীরে, পর্বতের কন্দরে কন্দরে সন্ন্যাসী ও সংসার-বিরাগীর আস্তানা, পার্বত্যজাতির ছোট ছোট নিভৃত জনপদ, তারা সভ্যতা-সম্পর্কলেশহীন, অরণ্যে গোপনচারী হিংস্র জন্তু জানোয়ার, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ। সেখানে অদ্ভুত উপায়ে চাষ আবাদ, গৃহপালিত পশু ক্রয়বিক্রয়, গৃহজাত শিল্প, সমস্তই কিছু কিছু রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কাশ্মীর থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর সীমানা দূর আসাম অবধি প্রসারিত হিমালয়ের এইটিই বিশিষ্ট রূপ। এই পর্বতমালার পদপ্রান্তে উত্তর ভারতে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য বহু শৈলশহর নির্মিত হয়েছে।

এই সকল শৈল-শহর সাধারণত চার হাজার থেকে আট হাজার ফিট উচ্চস্থানে অবস্থিত, এর নীচে অথবা এর উপরে বসবাসের আনন্দ নেই।

দুই সহস্র মাইল পরিব্যাপ্ত এই দীর্ঘ বিশাল পর্বতমালা বহু

জাতি ও বহুতর ধর্মাবলম্বীর আবাসস্থল। তারা পার্বত্য প্রকৃতির মানুষ, তারা অরুগ্ন, বলিষ্ঠ, শীত ভিন্ন অন্য কোনো ঋতুর আবির্ভাব তারা জানে না, তারা পরিশ্রমী, ভয়হীন সরল ও দরিদ্র। বহু জমিদার তাদের ভিতরে আছে বটে, কিন্তু বিলাসের জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। অনেক সময় দেখা যায় অনেক জমিদার মজুরী খাটাবার জন্য অপেক্ষাকৃত সমতল শৈল-সহরে আধুনিক সভ্যতার ভিতরে নেমে আসে। কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে, কাপড়, নুন, ছুঁচ-সূতো প্রভৃতি কিনে আবার নিজ গ্রামের দিকে উঠে যায়। গ্রীষ্মপ্রধান সমতল হিন্দুস্থানে তারা সহজে আসে না, এলে তাদের পক্ষে বাঁচা কঠিন। যদিচএরা সাধারণভাবে 'পাহাড়ী' নামে পরিচিত, তবু এদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। কাশ্মীরী, গাড়োয়ালী, নেপালী, ভূটানী, তিব্বতী, খাসিয়া—প্রভৃতি বিভিন্ন নাম। পাহাড়ী জাতি, সুতরাং সর্বস্থানেই এরা প্রায় খর্বকায় ও দৃঢ়-গঠিত। শীত-প্রধান দেশের মানুষ, সেজন্য এরা চির-রূপবান, দীর্ঘস্থায়ী যৌবনসম্পন্ন—প্রকৃতির অবারিত ঐশ্বর্যের মধ্যে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, অসুস্থতা এদের অপরিচিত।

যুক্তপ্রদেশের উত্তরভাগে যে পর্বতমালা আমি তাদের বেশী পছন্দ করি। এদিককার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, এই সকল পর্বতে হিন্দুর বহু তীর্থ ও দেবালয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। বিহার প্রদেশের উত্তরে স্বাধীন নেপাল রাজ্য অবস্থিত, সেইজন্য বিহার সরকার রাঁচীকে গ্রীষ্ম-রাজধানী মনোনীত করেছেন,—তাঁরা হিমালয়ের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত।

যুক্তপ্রদেশের পর্বতমালার তোরণদ্বার হচ্ছে হরিদ্বার। অরণ্য-জটায় ভূষিত যিনি মহাজট, যিনি যোগাসীন দেবাদিদেব, তাঁর বিরাট মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে হরিদ্বারই প্রশস্ত। হরিদ্বারের অপর নাম হর-কি-পারি—এই সেদিন এখানে

বিপুল আয়োজনে কুম্ভমেলা বসেছিল, লক্ষ লক্ষ যাত্রী পুণ্যস্নান করে গেছে।

আধুনিক যন্ত্রযানের যুগে তীর্থপথ এখন আর দুর্গম নয়। হাবড়া থেকে ট্রেনে উঠে বসলেই ত্রিশ ঘণ্টায় হরিদ্বারে পৌঁছান যায় সেখান থেকে গঙ্গার নীলধারার তীর ধ'রে যাও হৃষিকেশ— মাত্র পনেরো মাইল পথ। কোথাও ঝরণার ঝরঝরানি, কোথাও সন্ন্যাসীর তপোবন, বাবলার বন, ছোট ছোট দেবালয়। হৃষিকেশ ছেড়ে শুষ্ক নদী পার হয়ে পাহাড়ে চরাই উঠে যাও লছমন-ঝোলার দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ, তপস্যার মনোরম স্থান। ওপারে নীলকণ্ঠ পর্বত, স্বর্গাশ্রমের মন্দির, অসংখ্য সন্ন্যাসীর নিভৃত সাধনাকুঞ্জ। লছমনঝোলা পার হয়ে বাঁদিকে দেবপ্রয়াগের পথ দীর্ঘ ঋজুগতিতে দুর-দূরান্তরে চলে গেছে। চারিদিকে উদার উদাত্ত হিমালয়, নদীর কলগান, বনবিহগের কূজন-গুঞ্জন, বাস্তব পৃথিবীর কোনো সংঘাত-সংঘর্ষের কোলাহল সেখানে পৌঁছয় না। পথে চলো দেখতে পাবে, কোথাও বসন্তকালের সমারোহ, কোথাও ঝরাপাতার বিষাদ-মর্মর, কোথাও লতাবিতাম, কোথাও অরণ্যপুষ্পসমারোহের লজ্জাজড়ানো গন্ধ, আবার কোথাও বা পথবাহিনী নির্ঝরবালিকার চঞ্চলগতি। পরিশ্রান্ত পরিব্রাজকের চক্ষু পরম বিস্ময়ে ও বৈরাগ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসে।

পথ বড় বন্ধুর ও কষ্টসাধ্য। কিন্তু হিমালয়ের সকল পথই তীর্থপথ। হিমালয়ের মহান্ দৃশ্য মানুষের কল্পনাকে বিশালতর করে, হৃদয়কে করে প্রশস্ত। যত গভীরে যাওয়া যায় ততই যেন কোন্ এক বিরাটের রহস্যদ্বার খুলতে থাকে। প্রাণের খাদ্য প্রচুর, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ, অকিঞ্চিৎকর আনন্দ বেদনা যেন কোন মায়াবীর স্পর্শে মন থেকে মুছে যায়। পৃথিবীর কোলাহল, মানুষের শোক, তাপ, পাপ কিছুই সেখানে পৌঁছয় না।

হিমালয়ের এই অংশের নাম উত্তরাখণ্ড তপোলোক। দেব-

প্রয়াগ পর্যন্ত এই তপোলোক বিস্তৃত। পথে ব্যাসতীর্থের নিকট নয়ার নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল। শিলাতল ও পর্বতগুহার ঘূর্ণাবর্তে নদীগুলি এখানে অবিরাম কলধ্বনিমুখরিত। যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে, সন্ন্যাসীরা তপস্যায় বসে।

এর পরে দেবপ্রয়াগ। এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম-তীর্থ। অল্প পরিসর পার্বত্যশহর। রামচন্দ্রের বিশাল মন্দির এখানে বিখ্যাত, সঙ্গমের শিলাতলে বসে যাত্রীরা এখানে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করে। এখানে মস্তকমুণ্ডন বিধি। খরস্রোতা অলকানন্দার তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এখানে অতি মনোরম। কিছুকাল থেকে টিহরী গাড়োয়ালের পথে গঙ্গার অপর পারে হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত মোটর বাসের চলন হয়েছে। এই যন্ত্রযানে হয়ত আনাগোনার সুবিধা হয়, কিন্তু হারাতে হয় অনেক। তীর্থপথের আনন্দ প্রতি পদক্ষেপে, পায়ে হেঁটে না গেলে পথের সঙ্গে পরিচয় ঘটে না। যাঁরা হিমালয়ে যেতে ইচ্ছুক আমি তাঁদের উৎসাহ দেবো। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বড় সঙ্কীর্ণ, কোথাও এর বিস্তৃতি নেই, ব্যাপকতা নেই। হিমালয় ভ্রমণ করলে শক্তি ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, দুঃসাহসিকতার দিকে মন আকৃষ্ট হয়, হিমালয়ের বাতাস এবং তার মহিমময় দৃশ্য আমাদের স্বভাবের নানা বিকৃতিকে পরিমার্জনা ক'রে জীবনে নানা উচ্চভাব সঞ্চারিত করে। তীর্থযাত্রার নিগূঢ়তম কারণ এইখানে, হৃদয়ে নির্মলতা আনে, শুচিতা আনে।

দেবপ্রয়াগ থেকে চড়াই পথে প্রায় পঁচিশ মাইল অতিক্রম করলে রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম যেন দুইটি দুরন্ত বালিকা গলাগলি ক'রে নৃত্য করছে।

রুদ্রপ্রয়াগ একটি শহর। এই পর্যন্ত দেবলোক, এর পর ব্রহ্মলোক আরম্ভ।

ব্রহ্মলোকের পথে প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে তুষারমণ্ডিত

হিমালয়ের বক্ষে কেদারনাথের মন্দির। পথ দুর্গম। পথে চন্দ্রানদীর তীরে চন্দ্রাপুরী গ্রাম, অগস্ত্যমুনির চটি, ভীরী চটি, গুপ্তকাশী শহর, তারপর মৈখণ্ডা চটিতে দেবী মহিষমর্দিনীর মূর্তি, মন্দাকিনীর পরপারে দূরে উখীমঠ, পথের উপরে চড়াই উঠলে ত্রিকালদর্শী ত্রিযুগীনারায়ণ, পুনরায় নেমে এসে যাত্রা করলে পাওয়া যায় গৌরীকুণ্ড। এখানে জনশ্রুতি এই, দেবী পার্বতী গৌরী মন্দাকিনী-তটে ঋতুস্নান করেছিলেন। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

পুনরায় অরণ্যময় পার্বত্যপথ। মধ্যে চীরবাসা ভৈরব। এর পরে ধীরে ধীরে তুষারপতন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পাওয়া যায়। রামওয়াড়া পর্যন্ত গাছপালা নজরে পড়ে, তারপরেই মেঘময় আকাশ, বায়ুবেগ, তুষারপতন, শিলাখণ্ডময় কুয়াশাচ্ছন্ন পথ। কত যাত্রী কতবার বিপদে পড়ে এই পথে। ঠাণ্ডায় ও অত্যধিক তুষারপতনের নীচে অদ্যাবধি কত মানুষের সেখানে সমাধি হয়ে গেছে। এখানে চোখে শাদা আলোকের ধাঁধাঁ লাগে, তবু যতদূর যে দিকে দৃষ্টি যায় কঠিন তুষারের স্তর, তারই লহরে লহরে ধবলরূপ রুদ্রদেবের তাণ্ডবলীলা।

দুর্যোগের দুঃখে বিপর্যস্ত পরিব্রাজক এক সময় তার চির-ঈপ্সিত মন্দির খুঁজে পায়। বিরাট প্রস্তর মন্দির, নিকটে একটি বিশাল বৃষমূর্তি। মন্দিরের পদপ্রান্তবাহিনী দুগ্ধগঙ্গার জল স্পর্শ করা কঠিন—এতই শীতল। আশে পাশে কয়েকটি পাথরের ঘর—এইগুলিই অস্থায়ী যাত্রীশালা। মন্দিরের ভিতরে হিমশীতল অন্ধকারের গর্ভে একটি বিপুলকায় শিলাখণ্ড, ইনিই কেদারনাথ।

উত্তুঙ্গ তুষারকীরিট—জমাট বরফে চারিদিক আচ্ছন্ন—বরফের তীব্র আলোয় যাত্রীর চোখ অন্ধ, হিমকুয়াশার ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত তুষারপাত। চেয়ে দেখুন চারিদিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে কোথাও মানব সভ্যতা নেই, পৃথিবীর মধ্যে হয়ত আছি;

কিন্তু পৃথিবী বহুদূরে। বরফের কণায় আর বৃষ্টিধারায় জড়ানো উন্মত্ত বায়ুর বেগ আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করবে, ঠাণ্ডায় হাড়ে হাড়ে লাগবে কনকনানি। চারিদিকের পর্বতের গা বেয়ে অসংখ্য ঝর্ণার চীৎকার—যেন রুদ্র ভৈরবের গলায় লোলজিহ্বা সাপের দল ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে উঠছে।

আমরা একখানা পাথরের ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। ঘরটা বরফের স্তূপে ঢাকা, মাত্র দু'একটা ছিদ্র পথ। ক্ষুধার খাদ্য যৎসামান্য জুটলো, কিন্তু সমস্ত দিন শীতার্ত দেহে পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় কম্বল চাপা দিয়ে আধমরা জন্তুর মতো প'ড়ে রইলুম। কাঠের আগুন রাবণের চিতার মতো সারাক্ষণ জ্বলতে লাগলো। ছয় হাতি ঘরের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ছাব্বিশটি স্ত্রীপুরুষ। মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড, ঘরের ভিতরে আলো বাতাস নেই, কেবল সমস্ত রাত ধ'রে শীতার্ত যাত্রীদের গোঙানি শুনতে শুনতে প্রহর কাটতে লাগলো। কারো চোখে ঘুম নেই, এত ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় দেবদর্শন ও ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়েছে, কাল সকালেই আমরা পালাবো।

কেদারনাথের পথ দুঃসাধ্য সাধনের পথ। সময় এবং সুযোগ বুঝে না এসে আজ পর্যন্ত বহু যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে। সকলের বড় ভয় তুষার পতন। তুষারের গর্ভে জীবন্ত সমাধি ঘটেছে এমন উদাহরণ বহু পাওয়া গেছে। জল এখানে কাচের মতো কঠিন হয়ে যায়। যাই হোক, পরদিন প্রত্যূষে আমরা রওনা দিলাম। একটি রাত্রি বাস করেছি এই যথেষ্ট, আমাদের জীবনের পৃষ্ঠায় সেই রাতটি কঠিন আঁচড়ে লেখা থাকবে।

কিছু দূর এসে দেখলাম পিছনের কুয়াশায় কেদারনাথের বিশাল মন্দির অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমাদের যাত্রা এইবার বদরিনাথের দিকে। একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, আর একটা পরীক্ষা বাকি।

রামওয়াড়া, গৌরীকুণ্ড পার হয়ে এলাম নলাশ্রম চটিতে। আবার পাওয়া গেল মধুর বসন্তকাল। তিন মাইল উত্‌রাই নেমে মন্দাকিনী নদী পেলাম, নদী পার হয়ে ভীষণ চড়াই পথ অনেকটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে তিন মাইল উঠে গিয়ে পেলাম উখীমঠ। মুখ দিয়ে কেবল রক্ত উঠতে বাকি রইলো। উখী-মঠের আর এক নাম উষামঠ। পুরাকালে বানরাজা ছিলেন অসুর, তাঁর কন্যার নাম উষা। শিবভক্ত অনার্য বানরাজার কন্যাকে আর্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করেছিলেন। এই উখীমঠ সেই বানরাজার রাজ্য। ছোট পাহাড়ী শহর—বাজার, ডাকঘর, ফাঁড়ি, হাসপাতাল—সবই কিছু কিছু আছে। কেদার-নাথের পূজারী রাওল মহাশয় শীতকালে এখান থেকেই কেদার-নাথের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেন।

একটি রাত উখীমঠে, আবার যাত্রা করলাম পরদিন। আমরা ভুলে গেছি আমাদের দেশ, পরিবার, আত্মীয় স্বজন, আমরা যেন জীবনের মধ্যেও বেঁচে নেই, আবার মৃত্যুর মধ্যেও তলিয়ে যায়নি। তীর্থযাত্রীর দল তারা নিজের শক্তিতে চলে না, যিনি দুঃখে দুর্গমে দারুণে ভক্তের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার ক'রে কাছে টেনে নেন্‌, তিনি ছিলেন গতির সহায়।

দিনের পর দিন আমরা চড়াই উতরাই পার হয়ে চলেছি। কত চটি, কত তপোবন, কত সন্ন্যাসীদের আস্তানা, কত নূতন দেশ। আমরা দেখে দেখে চলে যাই। কত যাত্রী পিছিয়ে পড়েছে, কেউ রোগে জীর্ণ, কারো খোঁড়া পা, কারো সর্বাঙ্গে মাছির কামড়ের ঘা, কারো আবার চলবার শক্তি নেই। এমনি করে বহু দুঃখে পার হয়ে গেলুম পোথাবাসা, বানিয়াকুণ্ড, চোপতা ভুলোকনা, শ্রীতুঙ্গনাথ। কখনো শীত, কখনো বর্ষা ও বসন্ত, কখনো বা গ্রীষ্ম। বাইশ দিনের দিনে এসে পৌঁছলাম লাল সাঙ্গা বা চামোলী শহরে। শহরের নিচে বন গোলাপ

আর আখরোটের জঙ্গলের তলা দিয়ে অলকানন্দা নদী বয়ে চলেছে।

আজ দীর্ঘকাল পরে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। এই চামোলী শহরে পৌঁছে আমি রোগাক্রান্ত হই। যাত্রীরা আমাকে ফেলে চলে যায়। এই কথা ব'লে গেল, আমার ওপর 'বাবার' দয়া হোলো না। জ্বরে আমি অচেতন, দাঁড়াবার শক্তি নেই, চিকিৎসা নেই, পথ্য নেই। পথের মাঝখানে অনেকেই চির-কালের জন্য থেমে যায়, আমিও থেমে গেলুম। সমস্ত দিন বিকারের ঘোরে পড়ে রইলুম, অপরাহ্ণে গিয়ে ঝাঁপ দিলুম অলকানন্দায়। দেবতার দয়ায় আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু শরীর অবগাহন-স্নান করে যেন জুড়িয়ে গেল। শক্তি ফিরে পেলুম। আজ থেকে আমি সম্পূর্ণ একা, আমার আপন বলতে কেউ নেই। আবার আমি ঝোলাঝুলি কাঁধে নিয়ে লাঠি আর লোটা হাতে নিয়ে গেরুয়া জড়িয়ে চললুম।

আর মাত্র তিন দিন, মাত্র আর পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে বাকি। পথে পথে রাত কাটে, পথে পথে দিন যায়। প্রভাতে এক রক্তকরবীর জঙ্গল পার হয়ে গেলাম পিপুলকুঠিতে। মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছলুম গরুড়গঙ্গায়। এখানে গরুড়গঙ্গা আর অলকানন্দার সঙ্গমতীর্থ। জনশ্রুতি এই, এক ডুবে নদীর ভিতর থেকে পাথর তুলে নিয়ে বাড়ী গেলে জীবনে আর সর্পভয় থাকে না। গরুড়গঙ্গা থেকে গেলাম পাতালগঙ্গায় সন্ধ্যার সময়ে।

পরদিন গোলাপকুঠি থেকে কুমারচটি। নিকটে কর্মনাশা নদী, এখানে প্রাকৃতিক শোভা অনির্বচনীয়।

পথে আর দাঁড়াবো না, পথে পথেই নেবো বিশ্রাম।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ঝড়কুলা আর সিংহদ্বার পার হয়ে এলাম আমার সেই আবাল্যের স্বপ্নলোক যোশীমঠে। এখানকার অপর নাম জ্যোতির্মঠ। এইবার আরম্ভ হোলো শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম।

বদরিনাথের পূজারী রাওল মহাশয় এখানে থাকেন, শীতকালে এইখান থেকেই 'বাবার' পূজা নিবেদন করা হয়। যোশীমঠ থেকে বদরিকাশ্রম মাত্র আর উনিশ মাইল পথ। এই পথ দিয়ে বহু যাত্রী কৈলাস ও মানস-সরোবরের দিকে যায়। কিছুদূর গেলে ভবিষ্যবদরীর দর্শন মেলে। আমাদের আশেপাশে পাহাড়ের মাথায় তুষারের চিহ্ন দেখা গেল। আবার আমরা বরফের দিকে এগিয়ে এসেছি।

পরদিন প্রত্যুষে উতরাই পথে নামতে লাগলুম। তিন মাইল নেমে এসে পাওয়া গেল বিষ্ণুগঙ্গা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গম। নিকটে বিষ্ণুপ্রয়াগ তীর্থ। একদিকে নীলবসনা অলকানন্দা, অন্যদিকে গৈরিকবসনা ধবলীগঙ্গা, সে দৃশ্য অতি মনোহর, নয়নাভিরাম। পুরাকালে বিষ্ণু আরাধনা ক'রে দেবর্ষি নারদ এখানে সর্বজ্ঞ হবার বর লাভ করেছিলেন। এখানে বহু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে।

ধবলীগঙ্গার তীর ধ'রে সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে চললুম। পথ বিপজ্জনক। আশেপাশে মার্বেল পাথরের পাহাড়, কোনোটা শাদা, গোলাপী, কোনোটা নীল, কোনোটা হলুদবর্ণ। শরীর অবসন্ন, চড়াই উঠতে বুকে ব্যথা ধরে। অবশেষে এসে পৌঁছলাম পাণ্ডুকেশ্বরে। মন্দিরে এখানে তাম্রশাসন আছে,—এই পথে একদা পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছিলেন, তার অনেক চিহ্ন নাকি পাওয়া যায়। আশপাশে বহু ভূর্জপত্রের গাছ, কোথাও পাহাড়ের রঙ জবাফুলের ন্যায় রাঙা, কোথাও কালো, কোনটা নীলাভ। বদরিনাথের ফেরৎ অনেক যাত্রীর দেখা পাওয়া গেল —তারা বড় ভাগ্যবান। মুখে প্রসন্ন হাসি, আনন্দ, বদরীনাথের কীর্তন। আমাদের এখনো কাল পূর্ণ হয়নি।

লামবগড় চটি পার হয়ে এলাম হনুমানচটিতে। তখন সন্ধ্যা। আগামীকাল প্রভাতে বদরিকাশ্রম। হনুমানজীর প্রাচীন মন্দিরের

ধাঁরে এক ক্ষুদ্র ধর্মশালায় রাত কাটলো। আমি আজ তিন দিন পরে আবার আমার সঙ্গীদের সাক্ষাৎ পেলুম। তারা আমাকে দেখে অবাক।

সেই শীতের রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত ক'রে প্রভাত হোলো। প্রভাতে তুষারপাতের সঙ্গে নামলো বর্ষা। হিমের কণার সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা চাবুকের মতো সর্বাঙ্গে লাগতে লাগলো। সেদিন অতি দুর্যোগ। কোথাও পথে আর গাছপালা নেই—কেবল চারিদিকে দুগ্ধ প্রবাহের ন্যায় শাদা শাদা ঝরণা নামছে।

সেদিনকার প্রভাত আমাদের কাছে অদ্ভুত। দেবতাকে পাবার জন্যে জন্ম জন্মান্তর ধরে যেন আমরা চ'লে এসেছি। আজ যেন আমাদের অন্তিম দিন, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, শরীরে নেই চেতনা, যেন স্থবিরের মতো, পাগলের মতো, অন্ধের মতো পথ হাতড়ে চলেছি। কারো হয়েছে আমাশয় রোগ, কারো কানে লেগেছে তালা, কেউ আর কথা বলে না, কেউ পরণের কাপড় ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে চলেছে। আজ প্রভাতের পথ অতি সঙ্কটাপন্ন, কেউ কেউ প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে। অনেক নীচে তুষারময় নদী, পা পিছলে গেলে খুঁজে আর পাওয়া যাবে না।

বেলা কত জানি নে। কুয়াশায় আর বৃষ্টিতে আকাশ মলিন। আমার সঙ্গী অনেক স্ত্রী পুরুষ এরই মধ্যে আনন্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্না ছাড়া আনন্দ প্রকাশ করবার আর কোনো উপায় নেই। শীতের তীব্র বাতাস মুখে লেগে অনেকের মুখের কস বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

থমকে একবার দাঁড়ালুম। দূরের একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বুকের ভিতরটা যেন অজানা এক চেতনায় ধক্ ধক্ ক'রে উঠলো। তবে কি পেলুম এতদিনে? তবে কি সত্যই শেষ হোলো এই বিপুল প্রায়শ্চিত্তের পথ? দূরের প্রান্তরে দেখলুম এক বিচিত্র

অমরাবতী—মহাকালের সোনার মন্দিরের চূড়া, দেখলাম সর্বপাপনাশিনী মা গঙ্গা। ভগ্নকণ্ঠে কাতরস্বরে আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা কেঁদে উঠে বললে, জয়তু, জয় জয় বদরী বিশাল।

দুঃখের ইতিহাস রইলো পিছনে, আজ আমাদের যাত্রার শেষ। 'যে যায় বদরি—কভু না যায় উদরি।' মানবজন্ম তার আর হয় না, শাস্ত্রে বলে। আজ আমরা এসেছি স্বর্গে, বিরাট সৃষ্টি ও বিপুল প্রলয়ের যিনি অধীশ্বর—এসে পৌঁছেচি তাঁর পদতলে।

গ্রামের নাম বদরিকাশ্রম, কেউ বলে নারায়ণাশ্রম। এই দূর দুর্গমে মানব সভ্যতার বাইরে ছোট একটি গ্রাম! নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী কিছু কিছু পাওয়া যায়। এ ছাড়া ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, হাসপাতাল, মনিহারী দোকান, বইয়ের দোকান, এমন কি শুনলে অবাক হবেন, চায়ের দোকান পর্যন্ত পাওয়া গেল। পাহাড়ী ছাগলের পিঠে, ঘোড়ার পিঠে এখানে মালপত্র আসে। দূরের গ্রাম থেকে মেয়েরা জ্বালানি কাঠ মাথায় করে আনে, কারণ এখানে গাছপালা নেই। দুই এক স্থানে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে, সেখানে স্নান করা বড় আরামদায়ক। কেদারনাথের মতো মারাত্মক ঠাণ্ডা এখানে নেই—এখানে সেইজন্য মানুষের বসতি এবং দোকানপাতি বেশী। কিন্তু বৎসরের মধ্যে মাত্র পাঁচ মাস অথবা আর কিছু বেশী—বৈশাখ থেকে ভাদ্র অথবা আশ্বিনের মাঝামাঝি—এই পর্যন্তই মানুষের আনাগোনা, তারপর থেকে পুনরায় বরফ পড়তে থাকে। সমস্ত গ্রাম বরফে চাপা পড়ে যায়। ছোট গ্রামের চারিদিকে বিপুল প্রান্তর—আজকাল তারই একদিকে উড়োজাহাজ এসে নামে শুনেছি। উড়োজাহাজে মন্দির দর্শন হয় বটে, কিন্তু তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য কিছু কমে যায়। দুঃখের আগুনে পুড়ে খাঁটি হ'য়ে আসতে হয় ঠাকুরের কাছে—হিন্দুর মহা মহাতীর্থ সেই কারণে দুর্গমে অবস্থিত।

বদরীনাথ গ্রামের শেষ প্রান্তে ব্রহ্মকপালী। এইখানে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান দেওয়া বিধি। যেমন দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে পিণ্ডদান করা হয়। জনশ্রুতি এই, ব্রহ্মকপালী সর্বশেষ পিণ্ডদান ক্ষেত্র, স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষগণ এখানে উপস্থিত হ'য়ে অশরীরি অঞ্জলি পেতে সন্তানদের হাত থেকে পিণ্ড গ্রহণ করেন। এইদিকে সুরা বা চামরী গাই পাওয়া যায়। মাইল কয়েক দূরে বসুধারা। এখান থেকে দুইদিন তুষার পথে অগ্রসর হ'লে স্বর্গদ্বারে পৌঁছান যায়, সেই স্থানের নাম 'শতপন্থ'। দেবী দ্রৌপদী স্বর্গারোহণের পথে এই স্থানে ভূতলশায়িনী হয়ে বলেন,—হে ধর্মরাজ, সর্বাঙ্গে আমার পতন হোলো কেন? ধর্মরাজ জবাব দিয়েছিলেন, হে চিরায়ুষ্মতী অর্জুনের প্রতি যে তোমার গোপন পক্ষপাতিত্ব ছিল!

এইবার আমরা সোনার মূল মন্দির দর্শন করবো। বহু দুঃখ আর বহুদিনের ব্যথার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণুর চরণপ্রান্তে এসেছি, এবার তাঁর উদ্দেশে পরম প্রণাম নিবেদন করবো। আসুন, আগে আমরা এই দুর্গম হিমালয়ের তুষারগর্ভে ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির প্রদক্ষিণ করি। সমগ্র ভারতবর্ষে চার ধাম। দ্বারকাধাম, রামেশ্বর-ধাম, জগন্নাথধাম, বদরিনাথধাম। তিন ধাম দর্শন ক'রে এসেছি, চতুর্থ ধামে আজ আমারও শেষ তীর্থযাত্রা।

মন্দির অতি পুরাতন, কিন্তু একই ঋতুর আবহাওয়ায় অধিষ্ঠিত বলে আজো জরাজীর্ণ হয়নি। নাটমন্দিরটি বৃহৎ। সাধু, তপস্বী, পরিব্রাজক, যাত্রী, গৃহস্থ—উচ্চনীচ সকল জাতিরই সেখানে সমাগম। অন্নভোগ প্রশস্ত, সেই অন্নে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের সমান অধিকার। চারিদিকে দর্শনার্থীদের চীৎকার, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর বৃদ্ধ, রুগ্ন, ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, কারো সঙ্গে কারো প্রভেদ নেই।

অন্ধকারের ভিতরে মূল বেদীর উপরে ঘৃতদীপ জ্বলছে। শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি, পাশে লক্ষ্মী, অন্যান্য অনেকগুলি দেবমূর্তি। দেবতার দৃষ্টি প্রসন্ন, কিন্তু অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল—যেন বিশ্বের সকল মানবের কল্যাণ অকল্যাণের দিকে তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু।

পূজারী মহাশয় আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন। কিন্তু প্রণাম করব কি, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। চারিদিকে কান্নার কোলাহলে আর কাতর প্রার্থনায় আমারও বুকের ভিতরটা কেমন যেন উদ্বেল হয়ে উঠলো। অন্ধকারে দেবতার সেই জ্বলজ্যোতি চক্ষুর দিকে চেয়ে মনে মনে বললুম, হে পরশরতন, তোমার শুচিস্পর্শে যেন সব সুন্দর হয়ে ওঠে। আমার সন্দেহ, আর অবিশ্বাস আর মালিন্য তুমি দূর করো। আত্মঅহমিকা আর নাস্তিক্যবাদকে অতিক্রম করে এদের মতো আমিও যেন বার বার স্মরণ করতে পারি, আমি সেই আবহমানকালের হিন্দু, সেই চিরকালীন হিন্দুকুলে আমার জন্ম, আমার শিরায় হিন্দুজাতির সেই আদিম শুচিতাবোধ—হে ঠাকুর, তোমার চরণের তলায় আমিও যেন দলিত হই, ধন্য হই, কৃতার্থ হই।

কাশ্মীরে গিয়ে পৌঁছবার পথ প্রধানত দুটি। বছর দশেক আগেও রাওয়ালপিণ্ডি, সানিব্যাঙ্ক, কোহলা এবং উরি হয়ে মোটর-পথ শ্রীনগরে গিয়ে পৌঁছত, এখন সেই পথ আর অবারিত নয়। এখন যাওয়া আসা হ'ল পূর্ব পাঞ্জাব দিয়ে,—অর্থাৎ পাঠানকোট হয়ে যেতে হয়। আগে শিয়ালকোট থেকে জম্মু পর্যন্ত রেলগাড়ী

ছিল, কিছু কিছু পার্বত্যপথ অতিক্রম করতে হ'ত, এখন সেই পথের প্রাণধারা গেছে শুকিয়ে। রেলপথও উঠে গেছে। মোটরপথ এখন চলেছে পাঠানকোট থেকে জম্মু হয়ে শ্রীনগরে—মোট ২৬৭ মাইল পাকা সড়ক। পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর বিমানে যেতে লাগে এক ঘণ্টা।

জম্মু থেকে শ্রীনগরের পথে বানিহাল গিরিসঙ্কট পার হতে হয়, এবং এই গিরিসঙ্কটের উচ্চতা সমুদ্র সমতা থেকে ৯ হাজার ফুট। রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে কোহালার পথে গিয়ে দেখেছি, এত উচ্চতা কোথাও নেই। পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা সেখানে যেন বিতস্তা নদীর জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছে, এবং প্রায় তারই ধারে ধারে পর্যটকের পথ চ'লে গেছে দূর থেকে দূরে। ওই পথেই ডুমেল পেরিয়ে যেতে হয়,—যেখানে বিতস্তা আর কৃষ্ণগঙ্গার মিলন ঘটেছে পথের ধারে। সেখানে নত নমস্কার জানিয়ে স্বীকার করতে হয়, ভূস্বর্গের তোরণদ্বার অতিক্রম ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলুম। ওটি হোলো বিতস্তার পথ।

এদিকে অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা পেরিয়ে জম্মু নগরী ছাড়িয়ে যে সুন্দর পথটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যায়, সেটি বানিহালের পথ,—এটিও পীরপাঞ্জালের একটি অংশ,—এটি উধমপুর, কুদ প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে। এ পথ দিয়ে শ্রীনগর পৌঁছতে কম সময় লাগে। এটি প্রধানত চন্দ্রভাগা নদীর পথ, এবং মোটর যত দ্রুতই চলুক—পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর চৌদ্দ পনেরো ঘণ্টা লাগে। ভারত-কাশ্মীরের এইটিই এখন রাজপথ। কিন্তু এই পথের অসুবিধা ছিল এই, শীতের দিনের প্রবল তুষার-পাত। যদিও শ্রীনগরের উচ্চতা আসামের শিলং শহরের উচ্চতা থেকে বেশী নয়, তবুও প্রাকৃতিক ভূগোলের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখা ক্রমে কাশ্মীর হ'ল বিষুবরেখার বহু উত্তরে,—সেই কারণ শিলং অপেক্ষা শ্রীনগরে শীত এবং তুষারপাত অনেক বেশী।

সেপ্টেম্বর পার হলেই কাশ্মীরের জনসাধারণ শীতে কাঁপতে থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পরিমাণ ত্রিশ ইঞ্চির বেশী নয়, কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় প্রায় চারিদিকের পীর পাঞ্জাল থেকে বর্ষার যে ঢল নামে, তার পরিমাণ অনেক। এমন বৃহৎ ও বিশাল উপত্যকা হিমালয়ের আর কোথাও যেমন খুঁজে পাওয়া কঠিন, তেমনি কাশ্মীরের মৃৎপ্রধান চেহারাও অনেকের পক্ষে বিস্ময়। এত কোমল এবং এমন মৃন্ময় যে, সহসা পাথর খুঁজে পাওয়া যায় না। ধানক্ষেত, ফলের বাগান, এবং অন্যান্য ফলনের ক্ষেত্র পেরিয়ে যাবার সময় একথা মনে থাকে না যে, এই বিশাল সমতলের উচ্চতা কম বেশী পাঁচ হাজার ফুট। কিন্তু এই সমতলকেই বেষ্টন ক'রে রয়েছে পীরপাঞ্জালের শাখাপ্রশাখা। সেই সকল আকাশ ছোঁওয়া পর্বত চূড়ার উপর দিয়ে যখন স্নিগ্ধ হাওয়া নেমে আসে, তখন নিতান্ত গ্রীষ্মকালেও নববসন্তের মাধুর্য-অনুভূতি এনে দেয়। অবশ্য গরমের দিনে শ্রীনগর অঞ্চলে সূর্যের প্রখরতা বেশী, সাধারণত শহর এবং শহরতলীতে যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু সেই কারণেই পর্যটকরা গ্রীষ্মের দিনে শ্রীনগরে ব'সে থাকেন না, তাঁরা চলে যান্ এখানে ওখানে দিনের বেলায়,—রাত্রের দিকে শ্রীনগর স্নিগ্ধ। এর ওপর যদি মেঘ দাঁড়িয়ে ওঠে কোনও পাহাড়ে, এবং তার সঙ্গে হাওয়া ছোটে,—তা'হলে সমগ্র দেশের চেহারাটি যায় বদলে, এবং শীত নেমে আসে কনকনিয়ে। অর্থাৎ আবহাওয়ার চটুলতা কাশ্মীরকে কথায় কথায় সত্যই যেন মনোরম ক'রে তোলে এবং কাশ্মীরের জনসাধারণের প্রকৃতি যেমন,—তেমনি তাদের দেশের আবহের এই ক্ষণ-পরিবর্তনের মধ্যেও স্বভাবের কোনও প্রকার উগ্রতা অথবা রুক্ষতা দেখা যায় না। মৃন্ময় কাশ্মীরের পেলবতা তাদের প্রকৃতির সঙ্গেই জড়ানো।

হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর—এই দুটি

মাস অতি রমণীয়। বর্ষণের কাল শেষ হবার পর আকাশে যেমন দেখা দেয় নিবিড় নীলিমা, তেমনি তার নীচে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রকাশ পায় হরিতের শোভা, এবং ফলনের অজস্রতা।

কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ফোটে সেপ্টেম্বরে। সমগ্র উপত্যকা ফুলে ফলে এবং শস্যে পরিপূর্ণ হতে থাকে। বনে বাগানে প্রান্তরে রাশি রাশি বহু বিচিত্র বর্ণের পুষ্পলতা মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। বর্ণবাহার কার্পেট যেন বিছিয়ে থাকে পথে পথে। আপেল, আনার আর আঙ্গুরের বনে বনে পাক ধরে, রস ঝ'রে পড়ে বাগুগোসায় আর পিয়ারে, স্ট্রবেরি আর রাস্‌প্‌বেরিতে রঙীন হয়ে ওঠে চারিদিক। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে ঠাণ্ডা যখন নামে, কাশ্মীরিরা তখন সজাগ হয়। অক্টোবরে উঠে যায় একে একে শাকসব্জি, ফল পাকড়ের বাগান ক্রমশ খালি হতে থাকে, ফুলেরা দেখতে দেখতে আসর ছেড়ে চলে যায়। নভেম্বরের তুহিন হাওয়া মানুষকে কাঁপাতে থাকে—পথে ঘাটে তখন লোক চলাচল ক'মে আসে, পর্যটক আর চোখে পড়ে না। মেয়েরা ফল আর সব্জি শুকিয়ে ঘরে তোলে, শস্য উঠে যায় গোলায়, ঘরে ঘরে জ্বালানি কাঠ মজুদ করা হয়। প্রায় চার মাস ধ'রে ঘরের মধ্যে ব'সে শীতের দাপট সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

ভারতবর্ষের অন্য কোনও পার্বত্য শহর অপেক্ষা শ্রীনগর অঞ্চলে তুষারপাত ঘটে সকলের আগে। কিন্তু তারও আগে সমগ্র পীরপাঞ্জাল ঢাকা পড়ে তুষারে; শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সেই সব তুষারপাত সহজেই চোখে পড়ে। শুধুমাত্র তুষার পাতে হয়ত তেমন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তুষারপাতের সঙ্গে মেঘলা দিনে যখন তুহিন ঝটিকা ছুটতে থাকে, তখনকার জীবনযাত্রা একপ্রকার অসম্ভব। পথে বাহির হওয়া প্রায় সাধ্যাতীত, সরকারি কাজকর্ম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সাধারণ কাজকারবার, বিপনিবেসাতি প্রায় অচল, অসুখ বিসুখ হলে ডাক্তার বদ্যি

খুঁজে পাওয়া কঠিন,—শুধু দিবা রাত্র আগুন জ্বেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকা, এবং ব'সে ব'সে মজুত খাদ্য নিঃশেষ করা। কিন্তু সত্যি সত্যি ব'সে থাকলে কেমন করেই বা চলবে ?

সুতরাং শীতের ওই কয়মাস ধ'রে শ্রমিকেরা কুটীর শিল্পের কাজই ক'রে যায়। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান একখানি কাশ্মীরি শাল হয়ত সর্বাপেক্ষা দুরবস্থার মধ্যে তৈরী,—কে জানে! কোনও দল কাঠের কাজ নিয়ে বসে, কেউ রেশমের কাজ, কেউ কম্বল ও নামদা প্রভৃতি বুনতে ব'সে যায়।

প্রবল শীতের দিনে বানিহালের পথ তুষারাবৃত থাকে, সেইজন্য কাশ্মীর উপত্যকা জম্মু থেকে অনেকটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বানিহাল গ্রামের ওদিকে অন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ কাটা হয়েছে শীতকালে আনাগোনার সুবিধার জন্য। কিন্তু শীতের দিনে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে আসে জম্মুতে—শ্রীনগর থেকে দুশো মাইল পাঠানকোঠের পথে। নিতান্ত দুর্যোগ না থাকলে বিচিত্র তুষারজগৎ দুঃসাহসীকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায় পাহাড়ে পাহাড়ে তুষার প্রান্তরে, এবং যে জীবন-বৈচিত্র্যের আস্বাদ আমাদের একেবারেই জানা নেই—ত'ার সমগ্র আশ্চর্য পরিচয়টি আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে।

সূর্যের সোনার কিরণ এবং শুক্ল-পক্ষের জ্যোৎস্নায় যে-মায়ালোকের সৃষ্টি হয়, সেটি একটি অবাস্তব জগৎ, এবং সেই দৃশ্যের দিকে যে-ব্যক্তি মুগ্ধ চক্ষে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারও বাস্তব-চেতনা এক প্রকার লোপ পায়।

পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা সমগ্র কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমকে অবরোধ করে রয়েছে এবং এই প্রদেশের দক্ষিণ পূর্বের অবরোধ হোলো ধওলাধার গিরিশ্রেণী। আগেই বলেছি কাশ্মীর প্রবেশের

প্রশস্ত পথ হোলো দুটি। একটি হোলো রাওয়ালপিণ্ডি সানিব্যাঙ্ক কোহালা উবির পথ—যেটি গিয়েছে বারমুলা হয়ে শ্রীনগর,—প্রায় দুশো মাইল; অন্যটি হোলো শিয়ালকোট হয়ে জম্মু এবং জম্মু থেকে বাণিহাল। কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি এবং শিয়ালকোট একালে পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথটি এখন প্রশস্ত। এই পথে সাতষট্টি মাইল মোটরে গেলে শ্রীনগর পৌঁছানো যায়। নেপালের কাটমাণ্ডু এলাকা বাদ দিলে শ্রীনগর এলাকার মতো এমন বিশাল উপত্যকা হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সমুদ্রসমতা থেকে এই আধুনিক নগরের উচ্চতা ৫২০০ ফুট হলেও এর সমতল ভূভাগ বাঙ্গলাদেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনন্ত সৌন্দর্যের আধার হোলো কাশ্মীর, কিন্তু সেই সৌন্দর্যলোক দেখা যাবে শ্রীনগর থেকে বাইরে গেলে। আমাদের এ অঞ্চলে শহরের বাইরে গেলে যেমন বনময় গ্রাম, বিস্তীর্ণ শস্যপ্রান্তর এবং জলাবিলজঙ্গলঘেরা পারিপার্শ্বিক,—কাশ্মীর তেমন নয়। শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ মাইল ছেড়ে গেলেই অপরিচিত পৃথিবী তার রহস্যদ্বার খুলে দাঁড়ায়। আহ্বান করেনা, কিন্তু হতবাক্ ক'রে দেয়। এ পৃথিবীকে চিনিনে, এসব মানুষকে কখনও জানিনে। যে হিমালয়কে দেখে এসেছি আসাম থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত, সেই হিমালয় এখানে ভিন্নসজ্জায় প্রকাশমান। যে ভারতবর্ষকে দেখে এসেছি প্রতি ভারতীয়ের আকারে ও গঠনে, এখানে সেই ভারত বহু সহস্র বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন অভিনবত্ব নিয়ে বিরাজমান। অরণ্যে, হিমবাহে, প্রস্তরে, মৃৎপ্রকৃতিতে, গুম্ফায়, দেবদেউলে,—পৃথিবী এখানে নূতন।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে নানা পথ গেছে নানাদিকে। উত্তর-দিকের পথ বান্দিপুরা হয়ে মিনিমার্গের দিকে চলে গেছে। এই পথ দিয়ে একশো মাইল গেলে সিন্ধুনদ, সিন্ধুর পরপারে গিলগিট, সিন্ধুর দক্ষিণে পড়ে নাঙ্গা পর্বত। শ্রীনগরের পশ্চিমে বরমূলা

ও উরির পথ। এই পথে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে দক্ষিণ পশ্চিমের পথে গুলমার্গ যাওয়া যায়। এসব পথ খুবই সহজসাধ্য এবং যান-বাহনাদির সুবিধা।

শ্রীনগর থেকে সোনামার্গের পথ গিয়েছে উত্তরপূর্বে। মোটর নিয়ে যাওয়া যায় অনেকদূর অবধি,—সোনামার্গ পর্যন্ত। আনন্দে, কৌতুকে, সৌন্দর্যে ও স্বাস্থ্যে এ পথের তুলনা পাওয়া ভার। পৃথিবীর অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই, পাঁচটি মহাদেশ থাক তোমার কাছে অজ্ঞাত,—তুমি এখানে এসো, এই সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটে, এই পাইন-পপলার-চেনারের বনতলে,—এখানে ঝুরুঝুরু বয়ে চলেছে বন্য সিন্ধুনদের প্রশাখা, এই রাজতরঙ্গিনীর নিভৃত শৈবালাচ্ছন্ন শিলাতলে নির্জনে বসো,—চারিদিকে চেয়ে দেখো অগণ্য রত্নগিরি তাদের দ্বার খুলেছে অমরাবতীর; চিক্কণ সোনার বিন্দু যদি খুঁজে পাও তোমার পথে-পথে। কিছুদূর এগিয়ে গেলে সামনে জোজিলা গিরিসঙ্কট; ওপারে ভৈরবঘাটের কোলে গুহাতীর্থ অমরনাথ, আর এধার দিয়ে চলে গেছে দ্রাস হয়ে কারগিলের পার্বত্য পথ। শ্রীনগর থেকে কারগিল কম বেশী বোধ হচ্ছে একশো ত্রিশ মাইল। কারগিলে এসে হিমালয় দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে।

একটি হোলো উত্তরে দেবশাহী পর্বতমালা, অন্যটি দক্ষিণে জাসকার গিরিশ্রেণী।

এই দুইয়ের মাঝপথে উপত্যকা ধরে আন্দাজ কুড়ি মাইল পেরিয়ে গেলে সিন্ধুনদের মূল প্রবাহ। কিন্তু কারগিল থেকে জাসকার গিরিপথ ধরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ক্যারাভান পথ অতিক্রম না করলে সিন্ধু পার হওয়া যায় না। এই পথ দুস্তর এবং কষ্টদায়ক। অনেকাংশ বৃক্ষলতাহীন এবং জনশূন্য—মনে হবে কোনও শতাব্দির কোনও মানবসভ্যতা এ ভূভাগে পৌঁছয়নি। এইখানে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে লাডাখে পৌঁছান যায়।

লাডাখের ভিন্ন নাম হোলো পশ্চিম তিব্বত। সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে এই লামাশাসিত ভূভাগ ভারতের নিকট বহুকাল অবধি অপরিচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুগ্রহে এই দুরতিক্রম্য পথ সম্প্রতি সুগম হয়েছে। শ্রীনগর থেকে বিমানযোগে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে লাডাখের রাজধানী লে শহরে পৌঁছানো যায়। সাম্প্রতিক ব্যবস্থা অনুসারে বোধকরি প্রতিদিনই বিমান চলাচল করে।

কারগিল থেকে উত্তরে যে পথটি সিন্ধুনদের তীর ধরে সোজা উত্তরে স্কার্দুর দিকে গেছে, সেদিকের প্রধান বাসিন্দা হোলো সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। দক্ষিণের পথ এসেছে লাডাখের বৌদ্ধভূমে অর্থাৎ পশ্চিম তিব্বতে। এই ভূভাগের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ ভূভাগ কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিমালা এবং কৈলাস পর্বতশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পুরাকাল থেকে এটি ছিল কাশ্মীর ভারতের সীমানাপ্রদেশ, মধ্যযুগে এটি তিব্বতের অন্তর্গত হয়,—অতঃপর একশো বছরের কিছু আগে মহারাজা গোলাব সিংহের আমলে লাডাখ প্রদেশকে ভারতের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়, কিন্তু নাম থেকে যায় পশ্চিম তিব্বত। এককালে এই প্রদেশের নরনারী ভূতপ্রেত পিশাচ যক্ষ রাক্ষস অগ্নি ও সর্প নিয়ে থাকতো, পরে ভারতীয় বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক নেতারা গিয়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচার করেন। ফলে লাডাখে লামাধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

উত্তর প্রবাহিত সিন্ধু উপত্যকা ধ'রে এলে একসময়ে সিন্ধুর সাঁকো পাওয়া যায়। নীলধারা সিন্ধু এখানে সঙ্কীর্ণ, ওপারে খালাৎসে নামক একটি জনপদ। চারিদিকে তুষার পর্বত সমাকীর্ণ প্রাচীর। পথে কোথাও কোথাও প্রাচীন দুর্গ, কোথাও দেউল, কোথাও বা কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। পথে পথে ও জনবসতি অঞ্চলে একটির পর একটি বৌদ্ধ গুম্ফা ও মঠ। সর্বত্রই

লামা পুরোহিতের রাজরাজত্ব। তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারা বিচিত্র। বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র ও অনুশাসনে জীবন সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত।

সাড়ে এগারো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে লে শহরটি দাঁড়িয়ে। শহর বাজার দুই এক। আশ্বিনের শেষ থেকে ফাল্গুন অবধি লে শহর সভ্য জগৎ থেজে বিচ্ছিন্ন থাকে,—চারিদিক এমনই কঠিন বরফে আচ্ছন্ন। শহরের প্রান্তে সেঙ্গী নামজালের প্রাসাদের উপরে আরোহণ করলে দূরে কৈলাস পর্বতমালা এবং নিকটে লোহিতবর্ণ গিরিশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়।

ঐতিহাসিক দিক থেকে এই প্রাসাদ বিশেষ কালের বিশেষ কীর্তি বহন করে। এই শহরে আছে একটি খেলার মাঠ,—এই খেলা লাডাখীদের বিশেষ প্রিয়। অন্যান্য আহার্য ছাড়া জন্তুর মাংস এবং ছ্যাং নামক সুরা লাডাখীরা খুব পছন্দ করে, সুরাকে ওরা মন্ত্রসিদ্ধ করে নেয়। চেহারাতে ওরা বিভিন্ন ধরণের। খর্বকায় ও শক্তিশালী। মাথায় চামড়ায় টুপি, পরণে কম্বলের বিচিত্র পোষাক, পায়ে লোমজাত জুতো। শারীরিক ও পোষাকের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায় ওদের নেই। ওরা থাকে ভেড়া ছাগল কিংবা চমরী গাইয়ের পাল নিয়ে। স্ত্রীলোকদের দেখলে বিস্ময় জাগে। কপাল থেকে ঝুলছে নানাবর্ণের দামী পাথরের মালা, গায়ে জড়ানো জন্তুর চামড়া। একটি মেয়ে বিবাহ করে একাধিক পুরুষকে। মেয়েদের হাতে ঘরকন্না, কিন্তু সামাজিক বাঁধন কম। স্বল্পবিত্ত পরিবারে মেয়েরা বহু পতিব্রতার জীবন যাপন করে। সমতল উপত্যকায় চাষবাসই হোলো সাধারণ নরনারীর প্রধান নিত্য কর্ম।

সমগ্র লাডাখ এলাকায় যতগুলি বৌদ্ধ গুম্ফা আছে তাদের মধ্যে লামাউর, লিকির, ফিসাং, পিতুক, কাউচি এবং হিমিস গুম্ফা হোলো প্রধান। কিন্তু বর্তমান শতাব্দিতে প্রচুর প্রাধান্য লাভ করেছে হিমিস গুম্ফা। এই গুম্ফাটি লে শহর

থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত। ঘোড়া-ই হোলো লাডাখের প্রধান বাহন। শুধু লাডাখ কেন, হিমালয়ের যে কোনো দুস্তর পথে ঘোড়া ভিন্ন গতি নেই। একটি বৃহৎ গুম্ফাকে কেন্দ্র করে যেমন একটি গ্রাম গড়ে ওঠে, এখানেও তাই। সমগ্র ধূসর উষর পর্বতমালার নীচে এ যেন কতকগুলি সভ্যতা-বিচ্ছিন্ন নরনারীর একটি মহৎ আশ্রয়স্থল। মাত্র দুজন বাঙালী সন্ন্যাসী এই দুস্তর ও দুর্গম পথে এর আগে এসেছিলেন, তাঁরা দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। একজন এসেছিলেন উনিশ শতাব্দির শেষ দিকে এবং অন্যজন বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে। তাঁরা অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। মণিচক্র ও মণিদেওয়ালে আকীর্ণ হিমিসগুম্ফা। মঠের মধ্যে নানাবিধ বৌদ্ধ দেবী-দেবীর প্রকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত প্রতিমূর্তি। একটি দেবীমূর্তির নাম মন্দরা। ইনি নাকি বাঙ্গালী কন্যা, এবং অষ্টম শতাব্দিতে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কামনায়। এখানে ইনি আরাধ্যা দেবী।

বর্তমান শতাব্দির প্রথম দিকে এই হিমিস গুম্ফার ঐতিহাসিক প্রাধান্য প্রচার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডক্টর নিকোলাস নটোভিচ। ইনি এখানে এসে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন এবং তা'তে জানা যায়, যীশুখৃষ্ট তরুণ বয়সে পালিয়ে আসেন ভারতবর্ষে এবং গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে মন্ত্রসিদ্ধ হন। এই পুঁথির একটি নকল আছে লাসানগরের নিকটবর্তী আরেকটি গুম্ফায়। এ সম্বন্ধে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইখানির নাম হোলো "Unknown life of Jesus Christ." মূল পুঁথি পালি ভাষায় লেখা। যীশুখৃষ্ট সমগ্র আর্যাবর্ত ভ্রমণ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের বাণী থেকে তাঁর অহিংস মন্ত্র লাভ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে অতঃপর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন, কিন্তু তাঁর

পুনরুত্থানের পর তিনি পুনরায় আসেন কাশ্মীরে, এবং তাঁর শেষ জীবন এখানেই কাটে। এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে কোনও সুদৃঢ় প্রতিবাদ আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সম্ভবতঃ খৃষ্টান জগৎ এই প্রামাণ্য ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে।

লাডাখ বহুদূর এবং লাডাখের বৌদ্ধজগৎ আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এ হোলো দুঃসাহসীর পথ, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পথ। এখানে মরু-পাথর-কাঁকরের হাওয়া বয়; মধ্য এশিয়া এখান থেকে ডাকে তার মাঝখানে। ইয়ারখন্দ, খোতান, খোরাসান, তাকলামাকান,—এদের সংবাদ আনে তিব্বতি তাতার, গুজর, হুনজা ইত্যাদির ক্যারাভান। লাডাখে নতুন পৃথিবীর উদ্‌ঘাটন হয়।

সীমান্ত প্রদেশ বললেই আমরা একথা বুঝতে পারি যে, ভারতবর্ষের আর কোনো অংশের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কথা। ভারতের পূর্বে, পশ্চিমে দক্ষিণে প্রাকৃতিক বাধা আছে, সাগরে অরণ্যে পর্বতে বহির্ভাগ থেকে ভারতে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য, অবশ্য উড়োজাহাজের যুগে পৃথিবীর কোনো অংশই আর অগম্য নয়, কিন্তু উত্তর ভারতের একমাত্র পাঞ্জাবসীমান্ত ও কাশ্মীর প্রভৃতি ছাড়া সহজ-সাধ্য উপায়ে ভারতবর্ষে আসা কঠিন। উত্তর-ব্রহ্ম ও আসামের পথ অগম্য, নেপাল, গাড়োয়াল-সীমান্ত অতিশয় দুর্গম, পশ্চিম-সীমান্ত সমুদ্রে ও মরুভূমিতে ও উষর পর্বতে বিপদসঙ্কুল—

কেবল ওই এক সীমান্ত প্রদেশের ছিদ্র পথ দিয়ে নিখিল ভারতের চিরকালের ইতিহাস আপন গতি নির্ণয় করেছে।

গ্রীক এসেছে, তাতার এসেছে, পাঠান মোগল এসেছে, এসেছে শক-হুন—আর্য সভ্যতা, দ্রাবিড় সভ্যতা, জাতির নব নব উত্থান পতন—যা কিছু এই দেবভূমি ভারতে সংঘটিত হয়েছে তাদের সকলের বড় দায়িত্ব বহন করে এই পেশাওয়ারের পথ, গিলগিটের পথ, বোলন্ গিরি-বর্ত্মের পথ। নদীর যেখানে উৎপত্তি সেখানে তার ধারাটি ছোট, ক্রমশ সে যেমন স্ফীত হয়, তেমনি এই সব সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে যারা এসেছিল, তারা হয়ে উঠেছিল বড় বড় জাতি, বড় বড় সভ্যতার কেন্দ্র। পুরাতন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইংরাজ জাতিই ভারতবর্ষে ঢুকেছে জল পথে,—তারা সীমান্ত পথের সন্ধান আগে পায় নি। পেয়েছিল অনেক দেরিতে, আফগান যুদ্ধের সময় তাদের চোখ খুলেছিল। জেনেছিল এই ক্ষুদ্র খাইবার গিরিপথের গুরুত্ব কতখানি।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উপসীমান্ত এবং বেলুচিস্থান—এই চারটি প্রদেশকে সাধারণত সীমান্ত প্রদেশ বলা হয়।

ইতিহাসে দেখি রাজপুতনা, দিল্লী ও সিন্ধুদেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণে প্রধান প্রাচীরের কাজ করেছে। এই দিল্লীর পর থেকেই সীমান্ত প্রদেশ আরম্ভ। প্রথম যুগে আর্যসভ্যতার সীমানা থেকে পঞ্চনদ ছিল বিচ্ছিন্ন। উপজাতীয়গণের বাস ছিল কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রশাসনের অধিকার ভুক্ত ছিল না। মধ্যযুগে পাঞ্জাবের সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশেই আমরা দেখি হিন্দু-সংস্কৃতির চিহ্ন,—সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতির নানাবিধ লক্ষণ—কিন্তু দিল্লীর পরে পাঞ্জাবে প্রবেশ ক'রে আর আমরা এদের বিশেষ খুঁজে পাইনে।

মাঝখানে একটা কথা ব'লে রাখি। যাঁরা আধুনিক কালের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের সংবাদ রাখেন, তাঁরা জানেন যে, বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা উত্তর ভারত অতিক্রম ক'রে তক্ষশীলা হয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বৌদ্ধসভ্যতা বিস্তারের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ কেবল তক্ষশীলা নয়, পেশাওয়ারের পর কাবুলের পথে উপসীমান্তের বহুস্থানে তার নির্ভরযোগ্য প্রমান পাওয়া গেছে। বৌদ্ধসভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতারই সমগোত্রীয় ব'লে আমি মনে করি, সুতরাং সীমান্ত ও আফগানিস্থানের বৌদ্ধধর্ম বিস্তার হিন্দুধর্মকেই গৌরবান্বিত করেছে একথা বল্‌ব।

দিল্লীর পরে পাঞ্জাবে প্রথম প্রবেশ করলে দেখা যায় অনুর্বর উষর ভূভাগ। প্রান্তরের পরে প্রান্তর শস্যহীন—কৃষিকার্য সামান্য। প্রাকৃতিক কারণে শীত এবং গ্রীষ্ম অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশের মতোই পাঞ্জাবে কিছু বেশি। বালু, কাঁকর, পাথর ইত্যাদির সংমিশ্রণে মৃত্তিকা কঠিন। মৃত্তিকা কঠিন সেজন্য মানুষও বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু। বৃষ্টির পরিমাণ অল্প, সেজন্য জল, জলাশয়, নদীশাখা গাছপালা, অরণ্যবাহুল্য—এই সব তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না। আমি অবশ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করেছি, নৈলে পাঞ্জাব যে মরুভূমি নয় একথা সকলেই জানেন। আজকের দিনে নালাবাহিনী জলধারায় ও কৃত্রিম প্রণালীর দ্বারা পাঞ্জাবের বহুস্থান ফলবান শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

পাঞ্জাবে প্রবেশ করলে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বস্তু যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে হচ্ছে এই প্রদেশের গ্রাম সংগঠনের কল্পনা। আগে বলেছি মৃত্তিকা এখানে কঠিন, প্রান্তর ও ক্ষেত্রগুলি অনেকটা সাঁওতাল পরগণা অর্থাৎ মধুপুর গিরিডির মাঠের ন্যায় অসমতল ও পাথর কাঁকরে পরিপূর্ণ। পাঞ্জাবে ঢুকে দেখা যায় এই সকল রুক্ষ প্রান্তরের মাঝে মাঝে গ্রামবসতি, এবং সেই বসতিগুলি কঠিন মৃত্তিকায় নির্মিত,—আমাদের এদিককার পাকা

বাড়ীর তুলনায় সেগুলি দুর্বল নয়। গ্রামগুলি সাধারণত উচ্চ ভূমিতে নির্মিত, যেন এক একটি দ্বীপের মতো। কেবল তাই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেমন গ্রামের সঙ্গে পথের, পথের সঙ্গে শস্যক্ষেত্রের একটি বন্ধুতা সম্পর্ক, তাদের ভিতর বাহির যেমন একাকার,—এখানে তা নয়। এক একটি গ্রাম এক একটি দুর্গের ন্যায়। কেউ যদি গ্রামকে আক্রমণ করে তখন তাকে বাধা দেবার যথেষ্ট সুযোগ মেলে। শতাব্দির পর শতাব্দি বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহ্য ক'রে ক'রে সীমান্তবাসীর স্বভাবের ভিতরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সহজাত বলে মনে হয়। বংশ পরম্পরায় তারা বাইরের শত্রুর সঙ্গে ছিল সংগ্রামশীল, সেজন্য তারা বলিষ্ঠ, সাহসী এবং সেই জন্যই আজও সৈন্য সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবী-গণেরই দ্বারস্থ হতে হয়। মেসোপোটেমিয়া, আবিসিনিয়া, চীন, অতীত ও বর্তমান ইউরোপের যুদ্ধ, আফ্রিকা—সব জায়গাতেই বেশির ভাগ পাঞ্জাবী সৈন্যই অভিযান করেছে।

দিল্লী আগে পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল, এখন সে একটি নিজস্ব প্রদেশে রূপান্তরিত।

পাঞ্জাবের প্রধান শহরগুলির মধ্যে শিমলা, অমৃতশহর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, ভাওয়ালপুর, ডেরাগাঁজি খাঁ প্রভৃতি স্থানগুলিই বিশেষ খ্যাত। শিমলা শৈলশহরে পাঞ্জাবের গভর্ণর ও ভারতের বড়লাটের গ্রীষ্ম-নিবাস।

এক শহর অন্য শহরের অনুকরণ,— দার্জিলিঙ বলো, নৈনিতাল বলো, শিমলা বলো,—মোটামুটি ওদের চেহারা একই। দার্জিলিঙে মহাকালের নীচে ম্যালের মোড়, শিমলায় তার নাম হোলো রীজ। এখানে জলাপাহাড়ের মাথায় ওঠার আনন্দ, ওখানে যক্ষ পর্বতের উপর য়্যাডভেঞ্চার। এখানে বার্চহিলে উঠে চড়ুই ভাতি, ওখানে প্রসপেক্ট্ পাহাড়ে গিয়ে বন-ভোজন। কিন্তু এই কথাটা বল্‌ব পাঞ্জাবের যে কোনো শহরে সত্যকারের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

অমৃতশহর একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানে বহু রেশমকুঠি বর্তমান। এই শহরে ছুটি প্রধান দ্রষ্টব্যস্থান। একটি শিখদের স্বর্ণ মন্দির,—শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত মন্দির প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গুরু নানকের গ্রন্থ সায়েবের পূজা হয়। সংসারত্যাগী বহু শিখ এখানে ধর্মচর্চা ক'রে থাকেন। নিকটে সুউচ্চ ঘণ্টাঘর দণ্ডায়মান। কিছুদূরে এক সঙ্কীর্ণ গলিপথের ভিতরে আধুনিক ভারত-ইতিহাসের প্রখ্যাত স্থান জালিয়ানওয়ালা-বাগ। এই উদ্যানের চতুর্দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট লোকবসতি। অমৃতশহরের উপকণ্ঠে খালসা কলেজও কম বিখ্যাত নয়।

লাহোর, অমৃতশহর থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল। পাঞ্জাবের লাহোরই সর্বপ্রধান শহর। এই বিরাট শহরের সঙ্গে দিল্লীর তুলনা করা যেতে পারে। যুক্ত প্রদেশ অথবা পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি নগরকে মহানগর বলা যায়—যারা ওদিকে ভ্রমণ করেনি তাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন! বাংলা দেশে একমাত্র কল্‌কাতা ছাড়া বিশাল নগরী আর নেই, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে প্রত্যেকটি আধুনিক শহর দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, লোক-সংখ্যায়, বাণিজ্যে, শিক্ষাকেন্দ্রে —সব দিক দিয়েই অতি বৃহৎ। এর কারণটা ঐতিহাসিক। ভারতবর্ষের সভ্যতা ইংরাজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পূর্বে প্রসারিত হয়েছিল, আমার মনে হয় সেও একটা কারণ।

লাহোর কেন্দ্র থেকে সীমান্তের সব দিকেই অগ্রসর হওয়া যায়। উত্তরে জম্মু হয়ে কাশ্মীরের পথ, উত্তর পশ্চিমে রাওয়াল পিণ্ডি হয়ে পেশাওয়ার; দক্ষিণে রাজপুতনা; দক্ষিণপূর্বে করাচির পথ, পশ্চিম পথ জাকোবাবাদ হয়ে কোয়েটার দিকে।

মনে পড়ে কোয়েটার ভূমিকম্পের পরের দিন সি-এফ এণ্ড্রুজ সাহেবের পত্র নিয়ে আমি শিমলা থেকে যাত্রা করে লাহোরের পথ দিয়ে কোয়েটা রওনা হয়েছিলুম, কিন্তু মার্শাল-ল'

বলাবৎ হওয়ার জন্য আমাকে বেশিদূর অগ্রসর হতে দেওয়া হয়নি। ফিরে এসে লাহোরে দাঁড়িয়ে আমি দিনের পর দিন কোয়েটা-ফেরৎ আহত মুমূর্ষু ও সর্বস্বান্ত নরনারীর করুণ ও বীভৎস দৃশ্য দেখেছিলাম। আমার যাবার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে একমাত্র বাঙ্গালী যুবক আমার বন্ধু পরোলোকগত সাহিত্য-সমালোচক ও ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু সেই দুর্দিনে কোয়েটা গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

সেই বীর বাঙ্গালী যুবকের দুঃসাহসের কথা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রমহলে অতি পরিচিত।

লাহোর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি কমবেশি দেড়শত মাইল পথ। পথে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ অতিক্রম করতে হয়। রাওয়ালপিণ্ডিকে স্থানীয় লোকেরা সাধারণত পিণ্ডি বলে। পিণ্ডি দৃশ্যত দুইভাগে বিভক্ত। একটি সাধারণ শহর, অপরটি গোরা ছাউনি। গোরা ছাউনিতে কয়েকঘর বাঙ্গালী গৃহস্থ ও চাকুরীজীবী আছেন। এই শহর উত্তরভারত রক্ষার সেনাদলের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। এর অধীনে পাঁচটি শাখা,—লাহোর, চাক্‌লালা, পেশাওয়ার, ডেরা-ইসমাইল-খাঁ ও পিণ্ডি। এই সৈন্যদলের বিরাট দপ্তর গ্রীষ্মকালে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী হিমালয় পর্বতের উপরে মারীপাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়। রাওয়ালপিণ্ডি শহর থেকে কিছু দূরে ওয়েস্ট ব্রিজ নামক স্থানে বহু সহস্র সৈন্য একত্র থাকে, সেখানে সাধারণের যাতায়াত নিষেধ।

পিণ্ডিশহরে ও মারীপাহাড়ে আমি বহুদিন বাস করেছি। সৈন্যদলের দপ্তরে ছিল চাকুরী। মারীর অপর নাম কো-মারী। কো মানে পাহাড়। শিমলা পাহাড়ের পথে যেমন ধরমপুর, সোলন প্রভৃতি পাহাড়ী শহর, মারীর নিকট তেমনি সানি ব্যাঙ্ক, কোহালা প্রভৃতি। এই পথে মোটরে কাশ্মীর যাওয়া যায়,—পর্বত সীমার নীচে ঝিলম নদী। প্রাকৃতিক দৃশ্য এদিকে অতীব মনোরম। দূরে

নাগ পর্বত, আরো উত্তরে কারাকোরাম, পশ্চিম্ ও উত্তরে সুলেমান হিন্দুকুশ পর্বত—আর দক্ষিণ সমতল ভাগে একে একে সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, বিশাখা, ইরাবতী, দৃষদ্বতী, শতদ্রু প্রভৃতি নদ-নদী। নদীগুলি পার হয়ে রাজপুতনার দিকে গেলে চিরদুর্গম থর মরুভূমি—লাহোর থেকে কোয়েটা ও করাচীর পথে এই মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়।

মারী পাহাড় অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। শহর খুব প্রকাণ্ড। সৈন্য-দপ্তরকে কেন্দ্র ক'রেই এই শহরের আয়ব্যয় প্রধানত সম্পন্ন হয়। একটি প্রকাণ্ড গির্জা, কয়েকটি বড় বড় হোটেল, লরেন্স কলেজ, মদ্যপ্রস্তুতের একটি ভাঁটিখানা, নীচের দিকে একটি সমাধি ক্ষেত্র, কাশ্মীর পয়েন্টের দিকে দুটি বৃহৎ জলাধার—ইত্যাদি কয়েকটি দ্রষ্টব্যস্থান। শহরে আসা ও যাওয়ার পথ অনেকগুলি—পাইন পপলারের অরণ্যে, সুন্দর বাতাসে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, সেই পথগুলিতে ভ্রমণ করা অতি আনন্দদায়ক। এক একটি পথের নাম চিকা গলি, ঘোড়া গলি, বাশরাগলি, ছাংলাগলি ইত্যাদি। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন সম্রাট আমানুল্লাকে আফগানি-স্থানের সিংহাসনচ্যুত করার একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছে, এবং ভারতবর্ষে তখন জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিক এবং ইংলণ্ডের অন্যতম ভূতপূর্ব মন্ত্রী স্যার জন সাইমন রাজনৈতিক ভ্রমণে ফিরছেন,—তার নাম দেওয়া হয়েছে সাইমন কমিশন।

পাঞ্জাবের শেষ সীমানা সিন্ধুনদ। এই নদী যেখানে অতিক্রম করে উপসীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করতে হয়, সেই স্থানের নাম আটক,—আটক সেতু উপজাতির উৎপাতের জন্য আগে বিখ্যাত ছিল,—এই সেতু পার হ'লে ভারত গভর্ণ-মেণ্ট যাত্রীর জীবন রক্ষার জন্য আর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আটক পার হয়ে গেলে ইংরেজের অধিকৃত স্থান বড় অল্প,—রেল লাইনের দুই পাশে স্বাধীন

আফ্রীদীর রাজত্ব,—অর্থাৎ অনেকটা অরাজকতার রাজ্য। পেশাওয়ার ও নিকটবর্তী কিছু জমি বৃটিশের অধিকারে,—কিন্তু খাজুড়ীর মাঠ বৃটিশের নয়। পেশাওয়ারে পৌঁছে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখা যায়। এই শহর বৃটিশ সৈন্যের দ্বারা চারিদিকে সুরক্ষিত। সন্ধ্যার পরে কোনো ট্রেন এখানে যাওয়া আসা করে না, এখানে কিছুই ষোলআনা নিরাপদ নয়।

সে এক ঘন অন্ধকার ঠাণ্ডা শীতের রাত। ভীত চক্ষে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ট্রেনের ভিতরে ছিলাম আমি একা। নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। প্রচণ্ড শীত, কন্‌কনে। আটক নদী পার হয়ে প্রত্যূষে কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় ট্রেন এসে থামলো পেশাওয়ার ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট স্টেশনে।

সকাল হোলো। সকালের আলোয় শহরে প্রবেশ করে যা দেখা গেল, ভারতবর্ষে এক নেপাল ছাড়া আর কোথাও আমি সেই দৃশ্য দেখিনি। প্রথমে অনুভব করলাম ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনাধীনে আমি নেই, দ্বিতীয়ত সন্ধিচুক্তিবদ্ধ স্বাধীন আফ্রীদী-গণের অবাধ ও বেপরোয়া চলাফেরা, তারা সর্বদা সশস্ত্র—তারা না মানে শাসন, না মানে সমাজ। মুটে, মজুর, দোকানদার, চাকুরে, গৃহস্থ প্রত্যেকের হাতে বিনা লাইসেন্সের বন্দুক অথবা রাইফেল। তারা যেন এখানকার বৃটিশ প্রজাগণকে আপন করুণায় আশ্রয়ে অবহেলা ভরে রেখে দিয়েছে।

রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশাওয়ারে বাবুমহল্লা নামক বাঙ্গালীদের পাড়া আছে। বাবুমহল্লা থেকে বেরিয়ে মোটর ধরা গেল। একটি মোটর পথ ও রেলপথ বৃটিশ অধিকৃত একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে খাইবার গিরিবর্ত্মের দিকে যাত্রা করে। রেলপথের দুধারে খাজুড়ীর বিশাল অনুর্বর প্রান্তর—দূর সীমান্তে ভারতবর্ষের প্রাচীরের ন্যায় উষর পর্বতমালা।

পেশাওয়ার থেকে লাণ্ডিখানা অবধি ট্রেন—পথে পাহাড়ের ভিতর বহুসংখ্যক সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করতে হয়। মোটর ও ট্রেন প্রায় পাশাপাশি চলে। এই রেল ও মোটর পথ সদাসর্বদা খাইবার গিরিবর্ত্ম রক্ষা আফ্রীদীগণের প্রতি সতর্ক প্রহরার কাজে নিযুক্ত। পেশাওয়ার রক্ষার কাজে সৈন্যদল, সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার, মেসিনগান, উড়োজাহাজ প্রভৃতি সর্বদা নিযুক্ত। আর একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছি, এই খাইবার রেলওয়ে ট্রেনে আফ্রীদিগকে বিনা টিকেটে চলা ফেরা করতে দেখেছি, মনে হয় যেন তাদের কাছে গাড়ীভাড়া দাবী করার সাহস কারো নেই,—কিম্বা হয়ত এটা চুক্তিসর্তের মধ্যে পড়ে।

যদিও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত বর্তমানে একটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ এবং আজ যদিও সেখানে তথাকথিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত, তবুও সকলে জানেন ভারত গভর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত জমির পরিমাণ সেখানে বেশী নয়। এই অধিকার রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে সেখানে বহুকাল অবধি সংঘাত সংঘর্ষ চ'লে আসছে, আজো এর সম্পূর্ণ রফা হয়নি। যেদিন পেশাওয়ারে পৌঁছেছি সেইদিন সেখানে সাইমন কমিশনও আসবেন, এই সংবাদে চারি-দিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে। শহরে পুলিশ ও মিলিটারির সশস্ত্র আনাগোনা, অশ্বপৃষ্ঠে সেনাগণের ছুটোছুটি, পাহাড়ে পাহাড়ে মিলিটারি পিকেট, ট্রেনে ও মোটরে গোয়েন্দার দল—সমস্ত মিলে যেন একটা আসন্ন যুদ্ধের সূচনা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটলো। আমার মোটর খাইবার গিরিপথের দিকে অগ্রসর হোলো।

তখন প্রাণে কেমন একটা অজানা বিপদের আশঙ্কা জড়ানো আছে, কেমন তা বলতে পারিনে। হয়ত বৃটিশ এলাকার বাহিরে এসে আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়েছে সেই কারণে, হয়ত সংবাদ-পত্রে আফ্রীদীগণের সম্বন্ধে নানারূপ ভয়ানক বিবরণ পড়েছি সে

কারণেও। নিষ্ঠুর তারা, তারা ডাকাত, খুনে, লুণ্ঠনকারী, তারা পররক্তপিপাসু। কিন্তু কই, কোথাও তার চিহ্নও দেখিনি। পাঠানদের মুখে চোখে কেমন একটা স্বাস্থ্যময় বলিষ্ঠতার মহিমা, কেমন একটা নিরহঙ্কার সতেজ সারল্য। তাদের দীর্ঘ দেহ, কঠিন দৃঢ় মাংসপেশী, আশ্চর্য সুন্দর রূপ, আয়ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। সংবাদ-পত্রের বিবরণের সঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণের পদে পদে গরমিল হ'তে লাগল।

খাজুড়ীর মাঠে দুটি স্টেশন পড়ে। একটি ইসলামিয়া কলেজ, অপরটি জামরুদ দুর্গ। প্রথমটি আফ্রীদীগণের শিক্ষাকেন্দ্র, শুনলাম ভারত সরকারের তহবিল থেকে এব ব্যয় জোগানো হয়। জামরুদ দুর্গ পাথর-মৃত্তিকায় নির্মিত বৃটিশ সৈন্যাবাস।

এর পরে আমাদের গাড়ী খাইবার গিরিপথে প্রবেশ করলো। দুইধারে আফ্রীদীর এলাকাভুক্ত অনুর্বর গাছপালাহীন ধূসর পর্বত-শ্রেণী—মাঝে মাঝে দুর্গের গঠনে নির্মিত এক একটি আফ্রীদী গ্রাম—সেগুলি যেন মাটীর কেল্লা। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি ক'রে গম্বুজের ডগায় পাঠান প্রহরী বৃটিশ শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। পথে কোথাও জল, জলাশয়, শস্য-শ্যামলতা—কিছু নেই। রিক্ত, দরিদ্র, নীরস ও দুর্গম পার্বত্যভূমি যেন তৃষ্ণার্ত চক্ষু মেলে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রকৃতির এই হিংস্র মূর্তিই বোধ হয় পাঠানদের স্বভাবে পাওয়া যায়।

আমাদের মোটর ছুটতে লাগল। এক সময়ে পথের বাঁ দিকে পাওয়া গেল লোহিতবরণ বিশাল দুর্গ—শাগাই। পিঞ্জরের ভিতরে ব্যাঘ্র যেমন পদচারণা করে, তেমনি দুর্গদ্বাররক্ষী বৃটিশ সৈন্য বেয়নেট্-যুক্ত রাইফেল হাতে নিয়ে দুর্গদ্বারে পদচারণা করছে। কোথাও অশান্তি নেই। কোথাও শত্রুর সাক্ষাৎ পেলাম না। চারিদিক নীরব, থম থম করছে। যেন নিঃশব্দ বারুদের পর্বত স্তূপীকৃত হয়ে আছে, অশান্তির ছোঁয়া লাগলেই চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠবে।

পেশাওয়ার ও খাইবার গিরিপথের শেষ সীমা লাণ্ডিখানার ঠিক মধ্যস্থলে এই শাগাই দুর্গ অবস্থিত। বহুশত সৈন্য ও রসদ এই এই দুর্গে জমা রয়েছে। দুর্গ-প্রাকার অতি উচ্চ, অনেকটা আগ্রা দুর্গের ন্যায়। দেখতে দেখতে আমাদের মোটর দুর্গ অতিক্রম ক'রে গেল।

লাণ্ডিকোটালে এসে পৌঁছলাম। বিশাল এক উপত্যকায় বৃটিশ সৈন্যের অসংখ্য শিবির—যেন অসংখ্য পাখীর ছোট ছোট অস্থায়ী বাসা। চারিদিকে ব্যস্ততা, সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ, ইতস্ততঃ ধাবমান প্রহরীর দল, লোহার শিকলের আওয়াজ, বাঁশীর শব্দ, দলবদ্ধ সৈন্যের পদধ্বনি। আকাশ অতি নির্মল, সোনার মতো রৌদ্র, দূর দূরান্তরের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা,—মাঝে মাঝে বিউগল বাঁশীর আওয়াজ হেমন্তের প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নিকটে একটা কাবুলী সরাই, ভিতরে কয়েকটি উট, জবাইকরা মুরগী, একস্থানে স্তূপাকার রক্তাক্ত গো-মাংস, কয়েকটা ঘেরাটোপ, লোহার চিম্‌টে ঝোলানো কয়েকটা গড়গড়া, আঙ্গুর ও বাদামের কয়েকটা বস্তা,—সে একটা অদ্ভুত সরাইখানা। আফগানিস্থান থেকে ভারতবর্ষে যাবার সময় কাবুলীরা এখানে বিশ্রাম করে। পেশাওয়ারের পরে লাণ্ডিখানা অবধি স্ত্রীলোক ও শিশুর আমদানি করা নিষিদ্ধ। যদি বা তারা আসে তবে দিনের বেলাতেই চলে যায়।

দুইজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়র সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে ও আতিথ্যে ভ্রমণ সফল হোল। অপরাহ্ণকালে সাইমন সাহেব কমিশন-সহযোগে কয়েকটি মোটর নিয়ে এলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কামান গর্জন ক'রে উঠলো।

সমস্তদিন ভ্রমণের পর আমি ট্রেনে চ'ড়ে বসে পেশাওয়ার রওনা হলাম।

ইংরেজ এদেশে যতদিন ছিল ততদিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের অধিবাসিগণকে উপজাতীয় দস্যু বলে ঘোষণা করা হ'ত। তা'রা যে জাতিতে মুসলমান এবং তাদের জাতীয় জীবনের যে একটি আদর্শ আছে, একথাটি পৃথিবীর কোনও দেশে জানতে দেওয়া হত না। তাদের নাকি সমাজ নেই, নিজস্ব রাষ্ট্র নেই, স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি নেই,—কেবল দস্যুতা ও লুণ্ঠনই তাদের একমাত্র পেশা,—এই সমস্ত প্রচার-কার্য করে ইংরেজ এই সকল সীমান্তবাসিগণকে জগতের চক্ষে হেয় ক'রে রেখেছিল এবং তাদের ওপর হিংস্রতা বর্বরতার কলঙ্ক চাপিয়ে তাদেরকে শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখার সুবিধা পেয়েছিল। যদি কেউ কখনো ইংরেজের এই আচরণের প্রতি সন্দেহ অথবা প্রতিবাদ করত, তবে ইংরেজদের আদালতে তার কপালে জুটত শাস্তি।

আসল কথা, ভারতের মতো মূল্যবান সাম্রাজ্যকে সকল দিক থেকে নিরাপদ করে রাখার জন্য ইংরেজের চেষ্টার অন্ত ছিল না। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পাঠ ক'রে ইংরেজ একথা বুঝে নিয়েছিল যে, বাইরের শত্রু যতবার এসে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে, ততবারই তারা এসেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথ দিয়ে। সুতরাং এই পথের বহুদূর পর্যন্ত নিঃশত্রু করে না রাখতে পারলে নির্বিঘ্নে ভারতশাসন করা তাদের পক্ষে কঠিন। সেই কারণে ইংরেজ-আমলে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক বৃটিশ সৈন্য এই সীমান্তে পাহারায় নিযুক্ত থাকত এবং সমগ্র পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি

শহরকে এক একটি গোরা-ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল এছাড়া, ভারতে যত রেলপথ আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ রেলপথ ঘনসন্নিবিষ্ট মাকড়সার জালের মতো সমগ্র পাঞ্জাব একং সীমান্ত:দেশকে জড়িয়ে নিয়ে থাকত।

একথা মিথ্যা নয় যে, পুরাকালে শক, হুন, গ্রীক, তাতার, আফগান, তুরাণ, উজবেক, খুর্দি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক সীমান্ত প্রদেশের পথ দিয়ে ভারতবর্ষে হানা দিত। কিন্তু সে বহুকালের কথা। একালে মোগল-সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করে ইংরেজদের মনে ভয় ছিল, পাছে ভারতের বাইরের মুসলমানরা আবার এসে প্রতিশোধ নেয়। সেই কারণে ভারতের বাইরের মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যাতে কখনও মাথা তুলতে না পারে, সেদিকে ইংরেজের দৃষ্টি ছিল প্রখর। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ইংরেজ কখনও মুসলমানকে বিশ্বাস করেনি এবং ভারতের সমস্যা নিয়ে পাছে বাইরের কোন দেশ মাথা ঘামায়, এজন্য ইংরেজ ভারতকে নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা বলে সবাইকে সতর্ক করত। ওলন্দাজ, পর্তুগীজ এবং ফরাসীরা সমুদ্রপথ দিয়ে ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছিল ব'লে ইংরেজ ভারতমহাসাগরে এতকাল ধরে টহলদারি পাহারা মোতায়েন করে এসেছে। মোটামুটি একথাটা স্বীকার করতেই হবে, ইংরেজ-আমলে এই ভারতবর্ষে জলপথে অথবা স্থলপথে বাইরের কোনও শত্রুর আক্রমণ একটিবারও ঘটেনি!

আবার আমরা ফিরে আসি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী-দের কথায়। ইংরেজ এতকাল ধরে যেমন এদের মাথায় মিথ্যা কলঙ্ক চাপিয়ে এসেছে, তেমনি এদের মুখের কোনো কথা অথবা এদের জীবনের সুখ-দুঃখের কোনো আনুপূর্বিক কাহিনী যাতে কখনো আমাদের কানে না ওঠে—তার পাকা ব্যবস্থাও করে

রেখেছিল। আমরা কি একথা কখনো শুনেছি যে উপজাতীয় দস্যুরা নিজেদের দেশ শাসন করে, তাদের বিচারালয় আছে ব্যবসা-বাণিজ্য আছে, তাদের নিজেদের সংবাদপত্রাদি আছে, খাদ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, নিজেদের মুদ্রাচলন আছে? এসব আমাদের কানে নতুন ঠেকে নাকি? একথা কি আমরা ভেবে দেখছি যে, তারা সকলেই দস্যু নয়, সকলেই হিংস্র নয়? কখনো কি ভেবেছি যে, এরা আর পাঁচটা জাতির মতোই শান্তিতে বসবাস করতে চায়? কিন্তু ইংরেজ আমাদের কোনোকালেই একথা ভাবতে দেয়নি।

বৃটিশ-ভারত বলে আমরা যে-ভারতবর্ষটাকে জানতুম, তার পশ্চিম সীমানা হল সিন্ধুনদ। এই নদের পূর্বদিকে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমদিকে সীমান্ত ভূ-ভাগ। সীমান্ত ভূ-ভাগের মধ্যে কেবল যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আছে, তাই নয়,—এর মধ্যে আছে দরগাই, কোহাট, নওশেরা, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ ইত্যাদি জেলাগুলি। আজ থেকে বহুকাল আগে ইংরেজ এই সিন্ধুনদকে ধরে একদিন এই ভূ-ভাগকে ভাগ করেছিল, এবং আজকে যেমন ভারত আর পাকিস্তানের সীমানা-রেখাকে বলা হয় "র‍্যাডক্লিফ লাইন," তেমনি এই আফগানিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের মাঝখনের সীমানা-রেখাকে বলা হয় "ডুরাণ্ড লাইন"। এই ডুরাণ্ড লাইনের একপারে হল সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীরা, এবং অন্য পারে হ'ল বৃহৎ আফগান রাষ্ট্র।

কিন্তু এই সীমারেখা কেটে রাখলেও ইংরেজের মনে শান্তি ছিল না। তারা সীমান্তের এই অধিবাসিগণকে ছলে বলে ও কৌশলে বশীভূত করার চেষ্টা পেত। একেই ত ইংরেজ এই সীমান্তের অধিবাসিদের এলাকায় সৈন্যসামন্ত বসিয়ে এবং গায়ের জোরে তাদের ভূমি দখল করে তাদের মনে বিদ্বেষ জমিয়ে রেখেছিল, তার উপর আবার নিত্য নতুন ফিকিরে তাদেরকে

বশীভূত করবার চেষ্টার জন্য তারা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠত। ফলে, যারা ছিল শান্ত, তারা হয়ে উঠল দস্যু। দশবার মার খেয়ে এক-একবার তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করত। এইভাবে এতকাল ধ'রে ইংরেজ এই সীমান্তবাসীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এসেছে।

চার বছর আগে ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চ'লে গেল, তখন আমরা দেখলুম ইংরেজের সেই কলঙ্কের পসরা এসে পড়ল পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষের হাতে। ইংরেজ এতকাল ধ'রে যে-প্রভুত্ব চালিয়ে এসেছে উপজাতিদের ওপর, উত্তরাধিকারসূত্রে সেই প্রভুত্ব এবং দায়িত্ব এসে পড়ল পাকিস্তানের ঘাড়ে। অর্থাৎ, বিদায় নেবার সময় ইংরেজ যে কেবল হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া রেখে গেছে, তাই নয়, তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের ঘৃণা ও বিদ্বেষকেও জাগিয়ে রেখে গেল। আজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীর ঘৃণা ও আক্রোশের উপর পাকিস্তানের রাজ্যপাট চলছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যেমন, বেলুচিস্তানেও ঠিক তাই।

বেলুচিস্তানেও ওই একই ইতিহাস। তারা পাকিস্তানের বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। তাদের একটা অংশ গায়ের জোরে দখল ক'রে নিয়ে ইংরেজরা তার নাম দিয়েছিল বৃটিশ বেলুচিস্তান। ফলে, আরব সাগরের তীর থেকে আরম্ভ করে সুদূর উত্তরে চিত্রল এবং হিন্দুকুশের পূর্বপ্রান্ত অবধি বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে গিলগিটের উত্তর ভূভাগ অবধি জাতীয়তাবাদী সীমান্তের অধিবাসীরা বৃটিশ অনুপ্রাণিত পাকিস্তানের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সকলেই পাঠান এবং আফগানবাসী পাঠানগণের স্বগোত্রীয়। এরা যখন প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করে, তখন এরা স্বাধীন পাঠানিস্তানের জন্য আন্দোলন করতে থাকে।

এই সকল পাঠানদের প্রাদেশিক নাম হ'ল পাখ্‌তুন্‌, এবং এরা নিজেদের চেষ্টায় সম্প্রতি এক একটি কেন্দ্রে দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের এলাকা নিজেরাই শাসন করতে আরম্ভ করেছে, এবং প্রায় এক হাজার মাইল দীর্ঘ এবং দেড়শত মাইল প্রস্থ ভূ-ভাগের নামকরণ করেছে পাখ্‌তুনিস্তান। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই স্বাধীন এবং বেপরোয়া পাখ্‌তুন্‌দের সঙ্গে এখন পর্যন্ত কোন রফা করে উঠতে পারেন নি।

গান্ধীজী তাঁর জীবিতকালে এই দুর্ধর্ষ স্বাধীন পাঠানদের সমস্যার কথা জানতেন। কিন্তু ভারত-রক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ কখনও ভারতবাসীর পরামর্শ গ্রহণ করেনি, এবং ভারতের এলাকার বাইরে কোথায় কি ঘটছে, সে সম্পর্কেও ইংরেজ কখনও এদেশবাসীকে কোনো কথা জানতে দেয়নি। কিন্তু ইংরেজের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পাখ্‌তুন্‌রা সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, এবং বৃটিশ স্বেচ্ছাচারের কাছে পাখ্‌তুন্‌রা যে কোনকালেই বশ্যতা স্বীকার করবে না—এই কথাটি যিনি গান্ধীজীর কাছে বহন ক'রে এনেছিলেন, তিনি হলেন প্রাতঃস্মরণীয় খাঁ আবদুল গফুর খাঁ। খাঁ আবদুল গফুর খাঁ নিজে হলেন পাঠান পাখ্‌তুন্‌ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কালে তিনি হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি বাহিনী তৈরী করেছিলেন। এরা মনে-প্রাণে অহিংস এবং সমাজ-সেবক ছিল ব'লে এই বাহিনীর নাম ছিল খোদা-ই-খিৎমদগার। খাঁ আবদুল গফুর খাঁ আজও সীমান্তবাসীর চোখে অহিংসার মূর্ত প্রতীক্‌—সেই কারণে তাঁকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই ব'লে থাকে সীমান্তগান্ধী। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতালাভ করল, এবং ইংরেজ যখন ভারতের দুই দিকের দুটি অংশ কেটে তার নাম দিল

পাকিস্তান,—সেই সময় সীমান্তগান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁ স্বয়ং তাঁর খোদা-ই-খিৎমদগারের বাহিনী নিয়ে পাঠানিস্তান-আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এই পাঠানিস্তানেরই অপর এক নাম পাখ্‌তুনিস্তান।

সদ্যোজাত পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ খাঁ আবদুল গফুর খাঁর এই আন্দোলন বরদাস্ত করতে না পেরে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, আজও তিনি সেই কারাগারে বন্ধন-দশার মধ্যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করছেন! হয়ত তাঁর এ জীবনে আর কোনদিন মুক্তিলাভ ঘটবে না। কিন্তু সীমান্তগান্ধীকে বন্দী ক'রে রাখলেও পাখ্‌তুনিস্তান-আন্দোলনের গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। গত চার বছর ধ'রে এই আন্দোলনের তীব্রতা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এদের মোট কথাটা হ'ল এই যে ইংরেজ-আমলে এরা যখন কোনমতেই বশ্যতা স্বীকার করেনি, তখন ভারত স্বাধীন হবার পর এরা আর অপর কোন রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। চার বছর আগে খাঁ আবদুল গফুর খাঁ পাকিস্তানের সঙ্গে একটা রফা করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কোনও প্রকার আপোষ-মীমাংসার আগেই তাঁকে কারারুদ্ধ ক'রে সকল প্রকার আপোষের পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। পাখ্‌তুনরাও তাদের দাবি এক তিলও ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এই ভাবেই আজ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে।

প্রধানত সিন্ধুনদের পশ্চিম পার হ'ল উপজাতীয়দের অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে হ'লে সিন্ধুনদ অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। উত্তরে আটক, দাউদখেল্, কুন্তিয়ান, লেই এবং মামুদ্‌-কোট্। মামুদ্‌কোটের অপর পারে হ'ল ডেরাগাজী খাঁ,—এই জেলাটি সুলেমান পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে, এবং এই পর্বতের অপর পার হ'ল বেলুচিস্তান। সুলেমান পর্বতশ্রেণীর পূর্বাংশ অবধি

পশ্চিম-পাঞ্জাবের অন্তর্গত, এবং সিন্ধুদেশের উত্তরে কাশ্মোর নামক অঞ্চলে পশ্চিম-পাঞ্জবের শেষ এলাকা ধরা যেতে পারে। সিন্ধুনদ প্রবাহিত হয়ে চলেছে সিন্ধুদেশের প্রায় মধ্যস্থল দিয়ে, অর্থাৎ সিন্ধুনদের দুই পারেই হ'ল সিন্ধুদেশ। সমগ্র পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত জোকোদাবাদ অতিক্রম ক'রে গেলেই বালুচিজাতির এলাকায় পৌঁছান যায়।

বালুচদের একটা অংশ হ'ল উপজাতি। এরা থাকে মরুভূমিতে, কিংবা অনুর্বর পর্বত-অধিত্যকায়, কিংবা অনেক প্রকার দুর্গম ভূভাগে—যেখানে সভ্যতার অনেক সংবাদ পৌঁছয় না। অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতালাভের সংবাদ এই সকল উপজাতীয়গনের কাছ থেকে কয়েকদিন অবধি চেপে রাখা হয়েছিল। পাছে স্বাধীনতার সংবাদ পাবামাত্র এদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, এবং পাছে ইংরেজের চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে চ'লে যায়,—সেই কারনেই এদের এমন সু-সংবাদটি সহজে জানতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ প্রায় দেড় বৎসরকাল ধ'রে এদেরকে বাগ্মানাবার চেষ্টায় হিম্‌-সিম্ খেয়েও সফল হ'তে পারেননি। বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ, আশা করি, সকলেরই মনে আছে।

পাখ্তুন্‌দের এলাকায় প্রবেশ করবার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ হ'ল ক্যাম্বেলপুর থেকে আটকের পথ। ক্যাম্বেলপুর হ'ল পশ্চিম-পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি মস্ত রেলওয়ে জংশন। এই জংশন থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হ'লে ঝন্দ্ নামক ছোট্ট শহর পাওয়া যায়, এবং সেখানে সিন্ধুনদের সেতু পেরিয়ে সোজা পশ্চিমে গেলে কোহাট, থাল এবং বান্নু পৌঁছান যায়। বলা বাহুল্য, এখানে সিন্ধুনদ পেরিয়ে গিয়ে পাখ্তুন্‌দের দেশে পৌঁছন' কোন সময়েই বৃটিশ ভারতীয়গণের পক্ষে নিরাপদ ছিল

না। ইংরেজের আচরণের জন্য প্রত্যেক বৃটিশ ভারতীয় নাগরিক-কেই পাখ্‌তুন্‌রা বিপক্ষদলের লোক মনে ক'রে এসেছে। এমন কি, বিগত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন পণ্ডিত নেহরুর মতো লোক ভারত-সরকারের তরফ থেকে পাখ্‌তুন্‌-অঞ্চলে ভ্রমণ করতে যান, —তখন তিনি অহিংসা, ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে গেলেও লর্ড ওয়েভেলের কয়েকজন অনুচরের উস্কানিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপজাতীয়দের কয়েকজন গুণ্ডাশ্রেণীর লোক পণ্ডিতজীকে বারম্বার আক্রমণ করে। খাঁ আবদুল খাঁর ভ্রাতা এবং পণ্ডিতজীর প্রিয়বন্ধু ডক্টর খাঁন সাহেবের অপূর্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবে লর্ড ওয়েভেলের ইতর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। পণ্ডিতজীর প্রতি এবং ভারতের প্রতি এই জঘন্য আচরণের জন্য বিলাতের ভদ্র ইংরেজের টনক নড়ে, এবং অবশেষে মিঃ চার্চিলের বন্ধু লর্ড ওয়েভেলকে বড়লাটের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজের ইতিহাসকে যাঁরা কলঙ্কে মলিন ক'রে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লর্ড উইলিংডন, লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এবং লর্ড ওয়েভেল—এই তিনজন প্রধান। এঁরা তিনজনেই ভারতের বড়লাট ছিলেন।

দিল্লী থেকে একদা সোজা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যেত। পথ ছিল দিল্লী থেকে লাহোর, লাহোর থেকে শিয়ালকোট, ওয়াজিরাবাদ, লালমুশা, ঝিলম্—এবং ঝিলম্ থেকে রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি এককালে ছিল শিখ এবং হিন্দু-প্রধান অঞ্চল। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক রাত্রির রেলপথ হ'ল পেশাওয়ার। রাওয়ালপিণ্ডি এবং ক্যাম্বেলপুরের মাঝামাঝি পড়ে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যের আকর জগৎপ্রসিদ্ধ শহর তক্ষশীলা। ভারতের আদি ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য সামগ্রী আজও এই

তক্ষশীলায় বর্তমান আছে। এই তক্ষশীলার যাদুঘরের দায়িত্ব এই সেদিনও এক বাঙালীর হাতে ছিল।

ক্যাম্বেলপুর পর্যন্ত মোটামুটি বৃটীশ-ভারতের এলাকা ছিল। তারপর থেকে রেলপথের যাত্রীদেরকে বলা হয়ে থাকে, তারা যেন নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই বহন করে। আটক-পুলের কাছাকাছি সিন্ধুর এপার-ওপার নাকি যাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। উপজাতীয়গণ সম্বন্ধে একটি ভয় জন্মিয়ে দেওয়াটাই ছিল ইংরেজের কূটনীতি, কেননা, ভয় থেকে আসে অশ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা থেকে ঘৃণা। ভারতবাসী এবং উপজাতিগণের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে না রাখতে পারলে ভারতীয় কোষাগার থেকে উপজাতি-উৎপীড়নের খরচ নেওয়া চলবে কেমন ক'রে? সুতরাং ওখানকার পলিটিক্যাল এজেন্টের সকলের বড় কাজ ছিল বৃহৎ ভারতের চোখে উপজাতীয় দস্যুগণের হিংস্রতাকে ফুটিয়ে রাখা। এমন ছবি আমাদের সামনে ধ'রে রাখা হ'ত যেন ওদেরকে সায়েস্তা ক'রে না রাখতে পারলে ওরা যে-কোন মুহূর্তে ভারতের উপর হানা দিতে পারে! সেই ছবি আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে একদিন সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভয়ে ট্রেনে কাটিয়ে সকালবেলা শীতের হাওয়ায় জড়সড় হয়ে পেশাওয়ারের গোরা-ছাউনী স্টেশনে আমি নেমে ছিলুম। ভয়ের মধ্যেও একটুখানি সাহস ছিল মনে, কেননা আমি ছিলুম তখন ভারতের সৈন্যবিভাগের লোক, এবং রাওয়ালপিণ্ডি ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। আমি যান্ত্রিক বাহিনী বিভাগের লোক ছিলুম। সেদিন পাখ্‌তুন্‌ শব্দটা আমার জানা ছিল না, আমি ওদেরকে জানতুম আফ্রীদী পাঠান নামে। পেশাওয়ার হ'ল আফ্রীদী অঞ্চলের অন্তর্গত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওদের বিভিন্ন নাম, যেমন আফ্রীদী, ওয়াজিরি, মাসুদ, মামন্দ, উৎমানজাই, ইত্যাদি।

আমার মনে একটা ধারনা জন্মান' হয়েছিল যে, গোরা-ছাউনী স্টেশন এলাকার বাইরে যাওয়াটা নিরাপদ নয়, কেননা আফ্রীদী-রা হিংস্র। অর্থাৎ, পাছে আমি তাদের জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি লক্ষ্য ক'রে তাদের প্রতি মমতাসম্পন্ন হই অথবা তাদের কারো কারো মনের কথা শুনে আমার মনোবিকলন ঘটে,—এজন্য পূর্বাহ্ণেই আমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল। ওরা হিংস্র, ওরা দস্যু ওরা বন্যবর্বর,—এই কথাটাই সকলের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক্, এই উদ্দেশ্যটাই প্রকট।

পেশাওয়ার-অঞ্চল কেবল নয়, নওশেরা এবং তার দুইদিকের কোন অঞ্চলই ভারতীয় এলাকায় পড়ে না। কিন্তু ইংরেজ যেমন একবার ঘাঁটি ক'রে বসতে পারলে আর নড়তে চায় না, বরং নিজের সুবিধা-রক্ষার জন্য তিলে তিলে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল গ্রাস করে, ঠিক এখানেও তেমনি হয়েছে। ফলে, সীমান্ত-অঞ্চলকেও ইংরেজরা দুইভাগে ভাগ করেছিল। একভাগ বৃটিশ-সীমান্ত, অন্যভাগ উপজাতি-অধিকৃত। উপজাতিরা নিজের অধিকার আদায়ের জন্য যখন বৃটিশ এলাকায় হানা দেয়, তখনই সংঘর্ষ বেধে ওঠে। পেশাওয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে এই একই কথা। এই কূটনীতির বিরুদ্ধে আফগান-রাজ প্রতিবাদ তুলেছিলেন ব'লে ইংরেজের ষড়যন্ত্র তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

পেশাওয়ার থেকে বেরলেই বৃটিশ-এলাকার শেষ। আজ বৃটিশ-এলাকার প্রভুত্ব পেয়েছেন পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের কোন স্বস্তি নেই। উপজাতিরা তাদের স্বাভাবিক এবং জাতীয় অধিকার ফিরিয়ে নেবার জন্য অন্দোলন চালাচ্ছে। তারা খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে নিজেদের একছত্র অধিনায়ক ব'লে মনে করে কিন্তু সীমান্তগান্ধী আজ পাকিস্তানের কারাগারে নিরুপায়ে হতাশায় চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতের একশ্রেণীর

মুসলমানরা অন্দোলন চালিয়ে আজ পাকিস্তান লাভ করেছেন কিন্তু সীমান্তের পাখ্‌তুন্‌রা সুদীর্ঘ বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়েও স্বাধীনতালাভ করেনি, বরং তারা নতুন ক'রে আবার পাকিস্তানের অধীনে থাকতে বাধ্য হচ্ছে—এ রকম পরাধীনতা তারা কি বরদাস্ত করবে? তারা এতকাল ধ'রে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই ক'রে হাত পাকিয়েছে, পাকিস্তান কি তাদের বাগ্‌মানাতে পারবে? সুতরাং পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের হাজার মাইল জুড়ে রব উঠেছে—পাখ্‌তুনিস্তানের স্বাধীনতা চাই।

এদিকে পাকিস্তান সেই পুরাতন বৃটিশ নীতি ধ'রে চলছেন। তাঁদের বিশ্বাস, পাখ্‌তুন্‌দেরকে সায়েস্তা করতে গেলে হিংস্রতার পথ ছাড়া গতি নেই। সুতরাং মাঝে মাঝে পাকিস্তানের বিমান-বহর উড়ে গিয়ে স্বাধীন পাখ্‌তুন্‌দের ওপর হাম্‌লা ক'রে আসে, এবং পাখতুন্‌রাও তা'র প্রতিশোধ নেয়। তারা নিজ এলাকায় নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তাদের নিজেদের ফৌজ আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে, আছে নিজস্ব কোষাগার। এখন তারা তাদের সেই ভূভাগটা ফিরে চায় যেটা বৃটিশরা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে সেই সুবিচার কি তারা কখনো পাবে?

গোরা-ছাউনীর বাইরে সেই দিগন্তজোড়া খাজুড়ীর মাঠ। এই বিশাল প্রান্তর পাকিস্তান-এলাকার বাইরে। এ যেন ঘরটি আমার, আর উঠানটি অপর লোকের। খাজুড়ীর মাঠে অবাধে চ'লে ফিরে বেড়ায় স্বাধীন আফ্রীদী—তারাই হ'ল পাখ্‌তুন্‌। মাঠের ভিতর দিয়ে সরু একটি রেলপথ গেছে খাইবার গিরিপথের জটলার মধ্যে,—এটি এখন পাকিস্তানের দখলে। কিন্তু রেলপথের যাত্রী হ'ল পাখ্‌তুন্‌। জামরুদ, আলী মসজিদ, শাগাই, লাণ্ডিকোটাল্‌ আর লাণ্ডিখানা,—এই-গুলিকে সংযুক্ত ক'রে রেখেছে এই রেলপথ। পথ মাত্র পঁয়ত্রিশ

মাইল, কিন্তু এইটুকু পথের মধ্যে প্রায় দুইশত টানেল্। এই বিচিত্র রেলপথ ও টানেল্ সৃষ্টির গোড়ায় বাঙালী ইঞ্জিনীয়রের হাত ছিল। আমি যখন লাণ্ডিকোটালে পৌঁছেছিলুম, তখন সেখানে মিঃ ঘোষ ও চ্যাটার্জি নামক দুইজন ইঞ্জিনীয়র ও সার্ভেয়র নিযুক্ত ছিলেন। আমি ছিলুম মিঃ ঘোষের অতিথি। এই রকমই এক বাঙালী সেই সময়ে ছিলেন রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ছেচল্লিশ মাইল দূরে এক পার্বত্য এলাকায়,—'বাঁশরা গল্লি'তে—তিনি ছিলেন ওখানকার লরেন্স কলেজে ইলেক-ট্রীক্যাল ইঞ্জিনীয়র। নাম ইন্দু চট্টোপাধ্যায়। আজ তিনি কোথায়, জানিনে।

পাখ্তুনিস্তানের উত্তর-এলাকাই হল চিত্রল। চিত্রল-অঞ্চল ঘিরে রয়েছে কাশ্মীরের অন্তর্গত গিলগিট-এলাকা, এবং সমস্তটাকে জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুকুশের বিশাল পর্বতমালা। পাকিস্তানের আধিপত্য ওখানে এখনো সম্পূর্ণ স্বীকৃত নয়। হিন্দুকুশ পর্বতের উপত্যকা-পথে গিলগিটের ভিতর দিয়ে গেলে রুশ-সীমান্ত। এই ভুভাগে এসে মিলেছে পাখ্তুনিস্তান, গিলগিট, পামীর এবং রাশিয়া। এইখানে সম্প্রতি রাজনৈতিক দাবাখেলা চলেছে। এই ভূভাগে এসে দাঁড়িয়েছে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্বের চক্রান্ত, স্বাধীন কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের অধিপত্যের লোভ এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি। ফলে, সমগ্র জগতের সর্তক দৃষ্টি পড়েছে যেমন আজ কাশ্মীরের দিকে, তেমনি স্বাধীন পাখ্তুনিস্তানের জাতীয় আন্দোলনের পরিণতি দিকেও সকলের দৃষ্টি আজ সজাগ হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে।

আমাদের শাস্ত্রের কথা, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু অল্প মানে কী? কা'কে বলব বেশি, আর কাকেই বা বলি অল্প। যিনি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি তিনিও বলতে পারেন আরো বেশি চাই, আর যিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরানি তিনি একশো টাকা পেলে মনে করেন তিনি অনেক পেয়েছেন। সুতরাং দেখা গেল, কম আর বেশির কোন স্পষ্ট নিরীখ নেই। কিন্তু এই কথাটা শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, নাল্পে সুখমস্তি।

অল্পে সুখ নেই, তার মানে—যা আছে তাই সব নয়, আরো চাই। যতই পাই তৃপ্তি নেই, যতই সৃষ্টি করি পূর্ণতা নেই, যতই আবিষ্কার করি আনন্দ নেই। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনে এই বেদনাবোধ, অল্পে সুখ নেই। আগে মানুষ পরতো গাছের ছাল আর থাকতো গুহায় গর্তে। তারপর সন্তান-দের প্রতি স্নেহ মমতায় তাদের মনে সভ্যতা সৃষ্টির ব্যাকুলতা জন্মালো, তারা ঘর বানালে। গাছের বাকল ছেড়ে কাপড় পরলে সমাজ তৈরি করলে। আজ এই সভ্যতার শেষ যুগে এসে দাঁড়িয়ে তারা একে একে কী না আবিষ্কার করেছে? শূন্যে ওড়ালে জাহাজ, জলের নিচে গিয়ে জাহাজে লুকিয়ে রইলো, বিদ্যুতের তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলে মুখের ভাষা রেডিয়োয়, সহস্র যোজন দূরের ছবি দেখিয়ে বললে, টেলিভিশন্। কিন্তু তবু থামলো না, মানুষের ক্ষুধার অভিযান চলছে যুগ থেকে যুগে। অবিশ্রান্ত মৃত্যুকে তারা জয় করবে, ঈশ্বরকে আবিষ্কার করবে, জ্যোতিষ্ক লোকে পাড়ি জমাবে। অল্পে সুখ নেই। অসীম অধ্যবসায় সহকারে যা পায়, তাকে অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রে মানুষ আবার ছোটে

সেইদিকে যা এখনও পাওয়া যায়নি। সাহিত্য বলো, শিল্পকলা বলো, কীর্তি বলো—এর মধ্যেও সেই কথা, মনের যে কামনা, যে ক্ষুধা আর স্বপ্ন তাকেই প্রকাশ করা, তার জন্যেই ব্যাকুলতা জাগানো।

এর কারণ কি? এর কারণ হোলো মানুষের স্বভাবের মধ্যে বৈচিত্র্য আর নূতনত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। ঘর ভালো না লাগলে আমরা পথে বেরিয়ে পড়ি, পথ ভালো না লাগলে ঘরে এসে ঢুকি। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে, নিত্য নতুন ঘরে বাস না নিলে তাদের মন খুশি হয় না। অনেক ঈশ্বরসন্ধানী সন্ন্যাসী আছে যারা কোথাও স্থির হয়ে আসন পাতে না। তাদের প্রাণের মধ্যে চিরকালের অসন্তোষ এক ঠাঁই থেকে আর এক ঠাঁইয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর এক জাতের মানুষ আছে তারা বোহেমিয়ান্, ভবঘুরে, আত্ম-তাড়নায় কেবলই ছোটে। কোথাও তাদের বাঁধা অন্ন নেই, কোনো খোপেই তারা খাপ খায় না। কেবল খুঁজে বেড়ায় ঘর, আর মনে মনে বলে, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'।

এমনি বিচিত্রের সন্ধানে ছুটতে গিয়ে মানুষ পথে পথে বাসা বাঁধে। ঘরের মধ্যে আরাম ছিল, আনন্দ ছিল—পথে তা নেই, পথে আছে দুঃখ দুর্যোগ, ঝড়ঝাপ্টা, রোদ-বৃষ্টি। তবু সেই পথ ভালো লাগলো, সেখানে বৈচিত্র্যের আস্বাদ আছে, কঠোর ক্লেশের মধ্যে আছে শিকল ছিঁড়ে পালানোর স্বস্তি। সেই জন্য আমরা যখন কাজ থেকে ছুটি পাই তখনই বেরিয়ে পড়ি অজানার দিকে। যে জগতটুকু আমরা প্রতিদিন ধ'রে জানি, যার চেহারায় আর কোথাও নতুনত্ব নেই তাকে পিছনে ফেলে পালাই। যেদিকে যাবো যেদিকের কিছু জানিনে, তবু সেই অপরিচয়ের দিকে যাবার জন্য একটা অদম্য বাসনা মাথা কুটতে থাকে।

এই যেমন পূজোর ছুটিতে আমরা যেখানে হোক পাড়ি জমাই।

কেউ যায় পর্বতে, কেউ অরণ্যে, কেউ সাগরে, আবার কেউ বা দিগ্বিদিকে, কিন্তু ঘরে আমাদের মন স্থির থাকতে চায় না।

ছুটি মানেই মুক্তি। মেয়েরা ঘরের কাজ সেরে ছাদে গিয়ে বসে, সেটা তাদের মুক্তি ; ছেলেরা পাঠশালা থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে দৌড়য়, সেটা তাদের ছুটি। ছুটির ওপর আমাদের বড় লোভ, কারণ ছুটির মধ্যেই আমরা নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারি, পৃথিবীর সঠিক চেহারা চিনতে পারি। সেইজন্য ছুটির দিনে যখন আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণে বেরোই তখন তার নাম দেওয়া হয় চেঞ্জ, অর্থাৎ পরিবর্তন। যে পোষাকটা কাজের দিনে আমরা পরে থাকি, চেঞ্জে যাবার সময় মন থেকে সেটাকে ঝেড়ে ফেলি। নতুন সজ্জায়, নতুন পৃথিবীতে পালিয়ে যাই। গ্রীষ্মের ছুটিতে গেলুম পাহাড়ে, সেখানকার আবেশ স্নিগ্ধ বাতাস লঘু নির্মল, আমাদের প্রাণশক্তি হলো সজীব। হয়ত কোনো নির্জন পাইন কিম্বা ঝাউয়ের বনে একান্তে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কত বিচিত্র পাখীর কুজন গুঞ্জন, কত কীট পতঙ্গের নির্ভয় আনা-গোনা, পাহাড়ে পাহাড়ে, ঝর্ণার ধারায় ধারায়, ইউক্যালিপটসের ছায়ায় ছায়ায়, লতাপুষ্পের গায়ে গা বুলিয়ে আমরা গান গেয়ে বেড়ালুম।

মনে পড়ছে পাঞ্জাবের পাহাড়ী শহর শিমলায় আমাদের এক ভ্রমণের কথা। আমরা কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী মিলে গিয়েছিলাম প্রসপেক্ট পাহাড়ে বনভোজনে। পাহাড়ের শীর্ষটি ছায়া ঢাকা তপোবনের মতো, সেখানে আমাদের তাঁবু পড়লো। আমাদের প্রধান কাজ ছিল রান্না শেখা। এটাই বন-ভোজনের বৈচিত্র্য। কোন্ সব্জীর সঙ্গে কোন্ সব্জীটা মানানসই হয় তারই একটা হিসেব নেওয়া। সারাদিন এই রান্নার পরীক্ষা করাতেই ছিল আমাদের কৌতুক। ঘরে বসে আমরা যা খাই, পথে নেমেই সেই চর্বিত চর্বণে আমাদের রুচি চ'লে যায়। মন যেমন নতুন

স্বাদ পায়, জিহ্বাও তেমনি চায় নতুন আহার। পথে নামলে আমাদের সকল অভ্যাস যায় বদলে। এতে অসুবিধা হয়ত আছে, দুরবস্থাও হয়ত কিছু ঘটে, কিন্তু এতে আছে নতুন আনন্দের খোরাক।

বড় বড় ছুটির সময়ে ছেলেরা শিক্ষকের সঙ্গে যায় এক্স্কারশনে। এই ভ্রমণ কেবল মাত্র চেঞ্জ নয়, এর পিছনে শিক্ষার কথাটা থাকে। বাইরে যেমন ছুটোছুটির আনন্দ, মন তার পাশে থেকে তেমনি নিজের শিক্ষা নিজেই আহরণ ক'রে চলে। ধরো, পুরীর সমুদ্রের ধারে গিয়ে তাদের তাঁবু পড়লো। তারা শুনলো সমুদ্রের গর্জন আর বায়ুর স্বনন, দুরন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মাতমাতি করলো, কিন্তু একথা জেনে এলো যে—বাতাসে থাকে ওজন্, তা'তে নিশ্বাসের কাজ ভালো চলে, রৌদ্র ওঠা-নামার সঙ্গে সাগরের রং বদলায়, সমুদ্র-লতা কাকে বলে, উড্ডীন মাছ কেমন, লোনাজলের স্বাদ কিরূপ। জেনে এলো সীমাহীন সাগরের মহিমময় দৃশ্য কেমন। এইগুলি হোলো শিক্ষা।

ছবিতে ভাষা নেই, আছে নিশ্চল খণ্ড রূপ, তাতে প্রাণ অদৃশ্য। ছবি দেখেই যদি আমরা খুশি থাকতে পারতুম তাহলে পৃথিবীতে ভ্রমণের অর্থ থাকতো না, ঘরে বসেই আমরা দিল্লী আগ্রা দুর্গের ছবি দেখে কাজ চালাতে পারতুম! কিন্তু তা হোলো না, তাঁবু পিঠে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি দেশ দেশান্তরে, অজানা থেকে নিরুদ্দেশে। ছবির মধ্যে দৃশ্যমানতা আছে, কিন্তু প্রাণ নেই; পটভূমি আর পরিবেশ নেই। আগ্রার তাজমহল যমুনার তীরেও যেমন নিশ্চল, ছবিতেও তেমনি স্থাণু—কিন্তু আমরা কাছে গিয়ে তাদের সজীবতা আবিষ্কার করি। কারণ তার চতুর্দিকে রয়েছে প্রাণময় আকাশ আর বাতাস, প্রাণময়ী যমুনা আর শরৎরাত্রির জোৎস্না—সেখানে উদ্যান বীথিকার নির্জনে আমরা অশরীরি ছায়াচারীদের নিঃশব্দ নৈকট্য অনুভব করি।

পিঠে তাঁবু বেঁধে আমরা যাই অরণ্যে। ছবিতে আমরা দেখেছি গাছপালা, বন-জঙ্গল, কিন্তু অরণ্যের আবহের মধ্যে গিয়ে পাই অখণ্ড প্রাণস্পন্দন। লতায় পাতায়, শিকড়ে কোটরে, পতঙ্গে আর জানোয়ারে অদ্ভুত চক্রান্ত। সেখানে মানুষ নেই, কিন্তু কোটি কোটি জীবনের চলাফেরা। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম, জ্যোতিষ্কলোকের আশ্চর্য পরিবর্তন। যদি পথ হারাতুম সেই গভীর অরণ্যে তবে তারকার সঙ্কেত হিসাব করে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারতুম।

এমনি করে আমরা তাঁবু নিয়ে বেড়াই পথে পথে। বাইরের দিকটায় সংগ্রহ করি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর ভিতরের দিকে জমে ওঠে গভীরতর শিক্ষা। মেরুপথে, তুষারের দেশে গিয়ে মানুষ বরফের ওপরে বাসা বাঁধে। ঝড়ে ঠাণ্ডায় দুর্যোগে কত মানুষ সেখানে বরফের তলায় সমাধিস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কি থেমেছে? বরফ ঠেলে মৃত্যুকে পদে পদে জয় ক'রে তারা পথ আবিষ্কার করেছে, সেই তাঁবুর ভিতরে ব'সে তারা পৃথিবীতে নতুন কীর্তি রচনা করেছে, মানুষের বুকের দুর্জয়কে জয় করার সাহস এনেছে। আমরা হিমালয়ে গৌরীশৃঙ্গের আক্রমণের খবর পড়ে থাকি, নন্দাদেবী আর নাঙ্গা পর্বত অভিযানের কাহিনী জানি সেখানেও সেই পর্বতের পাদমূলে বেস-ক্যাম্প, সেই তাঁবু খাটিয়ে মানুষের চোখে কত অদ্ভুত বস্তু এসে হাজির হোলো, কত নামহীন জীবজন্তুর প্রাচীন অস্থি খুঁজে পাওয়া গেল, কত ধূলাবলুণ্ঠিত ধ্বংসাবশেষ প্রাক্‌ঐতিহাসিক কালের সংবাদ এনে দিল।

মধ্য এশিয়ার প্রাচীন বানিজ্য পথের কথা আমরা জানি। মহাদেশের এক প্রান্ত অবধি সেই মরুভূমির পথে যুগ যুগান্তকাল অবধি মানুষ দুঃসাহসিক যাত্রায় বেরিয়েছে। সেখানে পদে পদে মানুষ পথ হারায়, জলের তৃষ্ণায় বালুর ঝড়ের মধ্যে রৌদ্রের

জ্বালায় পোকার মতো তারা জ্ব'লে পুড়ে মরে, কিন্তু তবু তাঁবু ফেল্‌তে ছাড়েনি। কেন মানুষের প্রাণে এই প্রচণ্ড ক্ষুধা? কেন তারা তাঁবু পিঠে নিয়ে দুর্গম পার হয়ে চলে? ভারত সীমান্তে দেখে এসেছি তাঁবু ফেলেছে সৈন্য সামন্তের দল। দেশরক্ষা কেমন কৌশলে করতে হবে এই শিক্ষা তাদের হওয়া চাই। শত্রুপক্ষের চক্রান্ত, গোপন সংবাদ-চলাচলের চক্রভেদ, বিদেশী গোয়েন্দার বে-আইনি আনাগোনা, আকস্মিক বিপদকে আয়ত্ব করা, সমর-অভিযানের পথকে সুরক্ষিত রাখা, গুহা গহ্বর ও শত্রু কেন্দ্রকে কৌশলে অকর্মণ্য করে দেওয়া—এই হোলো সেখানে তাঁবু ফেলে রাখার প্রয়োজন। সেখানে স্থায়ী ঘর বাঁধলে চলবে না, স্থায়ী সেখানে কিছুই নয়, কারণ যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে অন্যত্র ডাক পড়তে পারে! তখন তাঁবুর বাঁধন উপ্‌ড়ে ফেলে তাদের নতুন অভিযান করতে হবে।

বিহারে পুন্‌পুন্‌ নদীর ধারে আমরা একবার তাঁবু ফেলেছিলুম। শীতের রৌদ্রে এক আমবাগানের ছায়ায় আমাদের বাসা। চারিদিকে অবারিত প্রান্তর, আখ আর অড়হরের চাষ, আমরা সেই শস্যক্ষেত্র পেরিয়ে নদীর তীরে তীরে চল্‌লুম পাখী শিকার করতে। সারাদিনমান কত বিচিত্র পাখীর চলাফেরা, তাদের অনেকের নাম জানিনে, কিন্তু সৃষ্টির আশ্চর্য মহিমা বুঝতে পারি। নূতন দেশে তাঁবু ফেললেই আমরা নূতন জগতে নেমে আসি; বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কানে কানে নূতন কথা বলে।

দেশের ভিতর দিকে যাও তাঁবু কাঁধে নিয়ে। সেখানে আমাদের জাতির সত্যকারের বাসা। সেখানে গ্রামের পর গ্রাম, তুমি তাদের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকো। ছোট ছোট সমাজ, কিন্তু সবগুলোকে জড়িয়ে একটা বৃহৎ লোকযাত্রা। সেখানকার গ্রাম্য জীবনের কী সুন্দর পরিচয়। তাদের মধ্যে কত কৌতুক কাহিনী, কত রীতিনীতি, কত বিচিত্র দেশাচার, কত

বিস্ময়কর সংস্কার। তাদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমরা অনেক পুরাকীর্তির কথা, রূপক গল্প, প্রাদেশিক ছড়া, প্রচলিত প্রবাদ, চাষার গান, হাস্যকর কাহিনী, কত কাব্য ও সাহিত্যের রস আস্বাদ করতে পারি। সেখানে আমাদের ঘর নেই বটে, কিন্তু তাঁবুই হয়ে ওঠে আমাদের আনন্দের কেন্দ্র। অথচ সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জাতির অন্দর মহলের পরিচয় সংগ্রহ করে থাকি।

আবার একদিন এমন আসে আমরা তাঁবু ফেলারও সময় পাইনে। তাঁবু সঙ্গে থাকে আর আমরা রেলের কামরায়, নৌকার ছইয়ের মধ্যে, ঘোড়ার পিঠে, জাহাজের ডেকে, উড়ো জাহাজের পাখায়,—আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন আর পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াই। সেদিন জল স্থল আর শূন্যকে নিয়ে কল্পনায় আমরা সোনার স্বপন বুনি বটে, কিন্তু যদি কোথাও তাঁবু সেদিন ফেলতে পারি তবে পাই আরাম, মধুরতর নিদ্রা।

পাশেই একটা মাধবীলতার ঝাড় উঠে গিয়েছে আশ্রমের প্রাচীর বেয়ে। ওধারে আশ্রমের পূর্বতন স্বামীজির একটি সমাধি কতকগুলি ঝরাফুল সমাধির ওপর ছড়ানো। সেখানে একটু আগে একজন তরুণ সন্ন্যাসী প্রদীপ দিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। মাথার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে চন্দনার দল সন্ধ্যার কাকলীতে আকাশ রোমাঞ্চ ক'রে দূরের প্রান্তরের দিকে ভেসে চলেছে। আমাদের পিছন দিককার বকুলের গাছ থেকে মৃদু মৃদু মধুর গন্ধ আসছে।

অনেকদূর আমাকে ফিরতে হবে। হিন্দুস্থানী গ্রামের পথে আলো কম। সেই পথ আ'ল বেয়ে মাঠের এক পাশ দিয়ে শহরের দিকে গেছে। মাঝখানে আটা-কলের শ্মশানডাঙ্গা। অনেকক্ষণ থেকে উঠি উঠি ক'রে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালাম। ফিরতে রাত হয়ে যাবে এই আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু স্বামীজি সহজে ছাড়ে না। আমি একজন পর্য্যটক শুনে অবধি তিনি যেমনই স্নেহশীল তেমনি আমার মতামত ও আদর্শ শুনে আমাকে সৎপথে ফেরাবারও একটি বাসনা হয়ত তাঁর মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। বলা বাহুল্য, এর পরে অসৎ সঙ্গে নষ্ট হবারও বয়স যেমন আমার নেই, সৎপথে ফিরে যাবার

বিস্ময়কর সংস্কার। তাদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমরা অনেক পুরাকীর্তির কথা, রূপক গল্প, প্রাদেশিক ছড়া, প্রচলিত প্রবাদ, চাষার গান, হাস্যকর কাহিনী, কত কাব্য ও সাহিত্যের রস আস্বাদ করতে পারি। সেখানে আমাদের ঘর নেই বটে, কিন্তু তাঁবুই হয়ে ওঠে আমাদের আনন্দের কেন্দ্র। অথচ সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জাতির অন্দর মহলের পরিচয় সংগ্রহ করে থাকি।

আবার একদিন এমন আসে আমরা তাঁবু ফেলারও সময় পাইনে। তাঁবু সঙ্গে থাকে আর আমরা রেলের কামরায়, নৌকার ছইয়ের মধ্যে, ঘোড়ার পিঠে, জাহাজের ডেকে, উড়ো জাহাজের পাখায়,—আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন আর পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াই। সেদিন জল স্থল আর শূন্যকে নিয়ে কল্পনায় আমরা সোনার স্বপন বুনি বটে, কিন্তু যদি কোথাও তাঁবু সেদিন ফেলতে পারি তবে পাই আরাম, মধুরতর নিদ্রা।

স্বামীজির ওখানে গিয়েছিলাম ধর্মজিজ্ঞাসা নিয়ে। কর্মে অনাসক্তি, সংসারে অরুচি, মনের অলসতা এবং স্বভাবে অসংযম, এই ছিল আলোচনার বিষয়।

আশ্রমের পাশে কুলু কুলু নদী, অশ্বত্থের ঝুরি নেমেছে জল-স্রোতে, তারই ছায়ার নীচে বাঁধানো পেটিকায় ছিল আমাদের আসন। নদীর পশ্চিম পারে এইমাত্র সূর্য নেমেছেন অস্তাচলে। স্বামীজি তন্ময় হয়ে আমাকে তাঁর বাণী শোনাচ্ছেন। মায়াবাদের সঙ্গে গীতার যোগ ও গরমিল কোথায়—আমরা সেই পথ ধ'রে অনেকটা এগিয়ে গেছি।

পাশেই একটা মাধবীলতার ঝাড় উঠে গিয়েছে আশ্রমের প্রাচীর বেয়ে। ওধারে আশ্রমের পূর্বতন স্বামীজির একটি সমাধি কতকগুলি ঝরাফুল সমাধির ওপর ছড়ানো। সেখানে একটু আগে একজন তরুণ সন্ন্যাসী প্রদীপ দিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। মাথার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে চন্দনার দল সন্ধ্যার কাকলীতে আকাশ রোমাঞ্চ ক'রে দূরের প্রান্তরের দিকে ভেসে চলেছে। আমাদের পিছন দিককার বকুলের গাছ থেকে মৃদু মৃদু মধুর গন্ধ আসছে।

অনেকদূর আমাকে ফিরতে হবে। হিন্দুস্থানী গ্রামের পথে আলো কম। সেই পথ আ'ল বেয়ে মাঠের এক পাশ দিয়ে শহরের দিকে গেছে। মাঝখানে আটা-কলের শ্মশানডাঙ্গা। অনেকক্ষণ থেকে উঠি উঠি ক'রে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালাম। ফিরতে রাত হয়ে যাবে এই আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু স্বামীজি সহজে ছাড়ে না। আমি একজন পর্য্যটক শুনে অবধি তিনি যেমনই স্নেহশীল তেমনি আমার মতামত ও আদর্শ শুনে আমাকে সৎপথে ফেরাবারও একটি বাসনা হয়ত তাঁর মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। বলা বাহুল্য, এর পরে অসৎ সঙ্গে নষ্ট হবারও বয়স যেমন আমার নেই, সৎপথে ফিরে যাবার উৎসাহেরও তেমনি অভাব। তবে ধর্মজিজ্ঞাসাটা হয়ত বা বয়ঃক্রমেরই একটা বাতিক—জানিনে ঠিক।

অবশেষে আমাকে এক সময়ে তিনি মুক্তি দিলেন। আশ্রমের সীমানা অবধি সঙ্গে সঙ্গে এসে তাঁর গেরুয়ার আবরণের ভিতর থেকে একবার বাঁ-হাতখানা বা'র ক'রে শুক্ল ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নায় হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রায় সাড়ে সাতটা, ন'টার মধ্যেই তুমি পৌঁছে যেতে পারবে। কাল আসছ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অবশ্যই। যে-কদিন আছি—

হ্যাঁ, নিশ্চয় এসো। আর শোনো, ওই ছোট বড় তামাক-টামাকগুলো সম্বন্ধে একটু সাবধান থেকো। ওগুলো ভারি অনিষ্ট করে, কাল বোঝাবো।

ইচ্ছে হোলো ফিরে দাঁড়িয়ে বলি, তাহ'লে কাল থেকে আর আসবো না স্বামীজি! কিন্তু চক্ষুলজ্জায় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

হাসির কথা থাক্। গোপেশ্বরের মন্দির পেরিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে আমি স্বামীজির ওই হাতঘড়িটার কথাই ভাবছিলাম। সন্ন্যাসীর তপোবন, পাশে নদীর ধারা, প্রদীপ জ্বালা কুটীর, বকুল-মাধবী-অশ্বত্থের ছায়াময় নির্জনতা, লোকযাত্রার কোলাহলহীন নিভৃত বিশ্রাম, এখানে জীবনের বৈরাগ্যটাই বড়। ওই পশ্চাদ্‌ভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীজির হাতঘড়িটা বড়ই বেমানান। ওর মধ্যে সময়ের সঙ্কেত, যন্ত্রের জটিলতা, ওর মধ্যে বিজ্ঞানের জগতের বিচিত্র জটলা। ছোট বেলায় গল্প শুনতাম, তপোবনে ঋষির আশ্রমে বালক-বালিকারা বেদ অধ্যয়নে রত—এমন সময়ে এসে দাঁড়ালো রাক্ষস। রাক্ষসের আবির্ভাবে তপোবনে সুরের ঐক্য লণ্ডভণ্ড হোল।

হাতঘড়ি আমার নিজের কাছে বিভীষিকা। ওর টিক টিক শব্দের মধ্যে আমি যেন মৃত্যুর আর মহাকালের পদক্ষেপ শুনতে পাই। আমার হৃদস্পন্দনের সঙ্গে ওর শব্দের কেমন যেন একটা যোগাযোগ—যেটা স্বস্তির নয়, নিশ্চিন্ততার নয়। রেলগাড়ীর চাকার তলায় যেমন চিরকাল শুনে এলাম, সময় নেই সাবধান, সময় নেই, সাবধান! হাতঘড়ির শব্দ অম্‌নি একটা কিছু বলে যা মনে ভয় আনে, দুর্ভাবনা আনে, যার অর্থ স্পষ্ট না হ'লেই সুখে থাকি। ঘড়ির দোকানে গেছি অনেকবার, কত ঘড়ি কত রকমের সাজানো,—কোনো ঘড়ির সঙ্গে কোনো ঘড়ির মিল নেই। সময় নিয়ে কেবল ছিনিমিনি খেলা, একই গোলকের

মধ্যে ওদের অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি। কাঁটা দুটোর সঙ্কেত ঘন্টার দিকে নয় মানুষের পরমায়ুর দিকে। ওরা ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিচ্ছে কালের যাত্রা, জানিয়ে দিচ্ছে অসার্থকতার সংবাদ, বারে বারে জানিয়ে দিচ্ছে ব্যর্থতার কথা। হাতঘড়ির কখনো সঙ্গদোষ ঘটে না। যত বড় পাপাত্মার কাছেই সে থাকুক, সে সত্যাশ্রয়ী। কাঁটা ঘুরিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বানাও, যেমন কেরানীরা তাদের ঘড়িকে অগ্রগতিশীল ক'রে রাখে,—তবু সে মিথ্যাচক্রেই ঘুরবে একান্ত সততার সঙ্গে। ঘড়ি চোখে পড়লে ভয়ে ভয়ে দেখি, ওর কাঁটার সঙ্গে আমাদের জীবনকাল, যৌবনকাল, আমাদের সুখদুঃখের ইতিহাস, আমাদের আত্মার অতীত ক্ষুধার কাহিনী—ওর সঙ্গে সব জড়িত। ভুল পথে যেতে দেয় না, নিয়ন্ত্রিত ক'রে রাখে। ঘুম পাড়ায় না, জাগ্রত ক'রে তোলে। স্বাধীনতা দেয় না, বারে বারে সতর্ক ক'রে দেয়। ওর ভিতরে কী যে চক্রান্ত, কী যে যন্ত্রণা—কী যেন যন্ত্রের অরণ্য, ওর স্নায়ুতন্ত্রে কেমন অশান্তি, সেই দৃশ্য দেখে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

গ্রাম ছেড়ে মাঠের পথ ধরেছি। আটা-কলের পাশে শ্মশান-ডাঙ্গা আসতে আর বিলম্ব নেই। স্বামীজির ওই হাতঘড়িটির কথাই ভাবছিলাম। ওটা বেমানান সুধু নয়, ওর সঙ্গে সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গতি রক্ষা হয়নি! ওদের আশ্রমের আকাশে সূর্য উঠুক, আলো নেমে আসুক ; সন্ধ্যার সময় সূর্যাস্ত হোক, অন্ধকার ছেয়ে আসুক ; জ্যোৎস্না দেখা দিক্, তারা জ্বলজ্বল করুক, সেখানে ঘড়ির কাঁটায় সময়কে শৃঙ্খলিত করার সার্থকতা কোথায় ?

কিন্তু এই অসঙ্গতি আর ঐক্যের অভাবই ত সর্বত্র। মনে পড়ছে কাশীর গঙ্গার ঘাটগুলির কথা। ঘাটগুলি পূর্বমুখী। দশাশ্বমেধ, দ্বারভাঙ্গা, অহল্যাবাঈ, চৌষট্টি-যোগিনী, কেদার, হরিশ্চন্দ্র—ইত্যাদি প্রায় ঘাটেই অধুনা প্রবল ও উজ্জ্বল বিদ্যুতের

আলো দেওয়া হয়। রাত্রের দিকে জনতার সুবিধার জন্যই এমন ব্যবস্থা সন্দেহ নেই।

কিন্তু কাশীর নিষ্প্রদীপ ঘাটগুলির একটি নিজস্ব মহিমা ছিল। ওই যে ওপারে ধূমবরণ-বালুবেলা—ওর মধ্যে ছিল একটি লোকোত্তর কবিতার অস্পষ্টতা। কোলের কাছে গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকার, জাহ্নবীর বর্ণও জ্যোৎস্নার মতো। এপারে জটাজুটধারী অতীত মুণির মতো প্রাচীন প্রাসাদ আর প্রস্তর সোপানশ্রেণী দণ্ডায়মান। রাজা মানসিংহ, রাণী অহল্যাবাঈ,—তাদের সঙ্গে কোন্ শতাব্দির কোন্ মহারাজা, কবেকার রাজা হরিশচন্দ্র, আর কোন্ পুরাতন মন্দিরের কোন্ পৌরাণিক কাহিনী,—এসব আমার জানা নেই! কেবল জানি, পশ্চিম পারেরপ্রাচীন প্রাসাদের অলিন্দের নিচে শুক্ল সপ্তমীর চন্দ্র যখন নামে, তখন কবিতার বেদনায় পাথরের ফাটলে ফাটলে অন্ধকার থরথর করে। সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ছায়ান্ধকারে অভিশপ্ত দৃষ্টির মতো ইলেকট্রিকের আলোটা জ্বলে, চোখে রূঢ় আঘাত করে।

আজকাল হরিদ্বারের ঘাটও তাই। সেই গম্বুজের মাথায় ঘড়ি, নিচে ইলেকট্রিকের আলো। অসহ্য, অবর্ণনীয় নির্লজ্জতা। দুর্গম তীর্থপথে লোকে নিয়ে যায় সিগারেট, শিশিতে জেলী, টিনে বিস্কুট। হিমালয়ের বদরিকাশ্রমের গ্রামে ঢুকে দেখি, সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপে জনৈক সাহেব সাজা বড়বাবু ইংরেজি বুকনিতে অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজকে আকর্ষণ করছেন।

আমাদের দৈনিক জীবনেও এই অসঙ্গতি চোখে পড়ে। প্রাচীনকালের মুনিকন্যারা গাছের বাকল জড়াতেন গায়ে, আর সর্বাঙ্গে পরতেন ফুলের অলঙ্কার। প্রকৃতির সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক। উলঙ্গ নরনারী পুষ্পস্তবকে লজ্জানিবারণ করলে তবেই ফুলের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। নচেৎ ফুলের ব্যবহার মানুষের পক্ষে নিষেধ। দেবতার অঙ্গে দেওয়া হবে পুষ্পসম্ভার, মানুষ

সেখানে অনধিকারী। কিন্তু আমরা আধুনিক কালের শহুরে মানুষ। চেয়ে দেখছি লালদীঘির পাড়ায় বীমা কোম্পানীদের সম্মেলনে যিনি কোটপ্যান্টপরা সভাপতি, তাঁর গলায় ঝুলছে গোলাপ-চম্পার মালা। ফুলের সেই অসম্মান কেবল সভাপতিদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁকে দশটা হাতখড়ি উপহার দেওয়া হোক, কিন্তু ফুলের একটি পাপড়িও তাঁর প্রাপ্য নয়। আজকের দিনে পুরুষেরা নাচছে, গান গাইছে, আর মেয়েরা মোটর চালাচ্ছে, চাক্‌রি খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই অসঙ্গতি ত নিত্যই দেখছি।

কীর্তনের আসর বসেছে। কথক ঠাকুর ভাবে আপ্লুত, আর শ্রোতার দল রসাবেশে বিভোর। সেখানে এলো চায়ের পেয়ালার ঠনঠনানি, এলো সাজাপান আর সিগারেট বিতরণের পালা। এই অসভ্যতা বর্বরোচিত। সেখানে ফুলের বৃষ্টি হোক, কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিক্‌—সেখানে রসনার ইতর আস্বাদের চেষ্টা কেন? রবীন্দ্রনাথের গান যদি কোথাও হয়, তবে সে হোক বীণাযন্ত্রে, হোক তানপুরা-বেহালা-একতারায়, হোক সে গান বেণু-বাদনে। সেখানে হারমোনিয়ম আসে কোন্ লজ্জায়?

নগরের লোক-কোলাহলের মধ্যে একবার এক সন্ন্যাসীর লাঞ্ছনা দেখেছিলাম। ট্রাম-বাস মোটর রিকসা-সাইকেল, দোকানে-অফিসে ফিরিওয়ালা, আর ছুটোছুটি-তাড়াতাড়ি হাঁটা-হাঁটি ধাক্কা-ধাক্কি, ঠিক মাঝখানে এক জটাজুটধারী অস্থিমালা পরা, বিভূতি ভূষণ, লেংটিযুক্ত সন্ন্যাসীকে ধ'রে সেই জনস্রোতের মধ্যে কয়েকটি লোকের কৌতুক উপভোগ। সন্ন্যাসী উদ্‌ভ্রান্ত। কারো বিদ্রূপ, কারো সংশয় আর রসিকতা, কারো তিরস্কার; কেউ তাকে চোর বলে, কেউ টানে জটা ধ'রে, কেউ বা বিগলিত স্নেহে সন্ন্যাসীর গলা জড়িয়ে টানাটানি করে। সন্ন্যাসীর এইরূপ শাস্তিই প্রাপ্য। কারণ তপস্বী যারা তাদের পিছনের পটভূমিকায় থাকে একটি তপোবন, পার্বত্য নির্ঝরিণী, নিভৃত নির্জনতা, পাখীর কাকলী,

আকাশের প্রসন্ন আলো, রজনীর নম্র কোমল অন্ধকার। তারা পৃথিবীবাসী হয়েও অমর্ত্যলোকের। কিন্তু সেই তপস্বী যদি তার ওই পশ্চাদ্‌ভূমিকা ছেড়ে নেমে আসে বউবাজারের অফিস পাড়ায়, তবে সে মূর্তিমান বিরক্তি, সে বাধা, সে নগরের কর্মস্রোতের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বিপত্তি। আসলে ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড মানুষকে টানে। যাকে আমরা বিদ্রূপ করি বেমানান অবস্থায়, তাকেই আবার মান্য করি তা'র যথাযোগ্য স্থানে। হরিদ্বারের নীলধারার তীরবর্তী তপোবনে অনেক অসাধু ও সাধুর সম্মান পায়, বউবাজার স্ট্রীটে অভ্যাগত অনেক পথভোলা তপস্বীও লোকের হাতে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়, একথাও মানি। তবু পটভূমি না থাকলে মানুয়ের সত্যমূল্য নির্ধারণ করা কঠিন—এই কথা মনে না রাখলে পদে পদে ছন্দপতন।

তাজমহল দেখেছি, সেখানে আলো উজ্জ্বল নয়, ভাবুকের স্বপ্ন ভঙ্গ হয় না। সেখানে জ্যোতির্ময় সমাধিমন্দিরের চারিদিকে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার থমথম করে, এবং শুক্ল রজনীতে উধাও আকাশের পটভূমিকায় একাকী মন্দির কল্পমায়া বিস্তার করে। কিন্তু তবু তকমা আঁটা উর্দিপাজামাপরা চাপরাশিরা সখানে অসঙ্গতি। পোষাক-আসাক সমেত তারা বেমানান। তাদের পরণে ফকিরের বেশ দেখলে খুশী হতাম।

যারা কবি, যারা আত্মার রহস্যের ভাষা শোনায়, তারা কেন পাঞ্জাবি প'রে বাস করে লোকালয়ে? কেন তাদের প্রসাধন-পারিপাট্য? তারা থাকুক নেপথ্যে, অলক্ষ্যে। সাধারণের নাগালের বাইরে দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে তা'রা কেবল থাক্ বাণীদায়ক। দেহের নির্দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ হ'তে থাকলে অপরিচয়ের আনন্দ ম'রে যায়। অতি পরিচিত কবি-মনুষ্য ব্যঙ্গের বস্তু হয়ে ওঠে স্থূলভতার জন্য। দূরত্বের দ্বারাই সে আকর্ষণ করে, ব্যবধানের দ্বারাই সে অনুরাগীর

কল্পনাকে সুন্দর করে। নৈলে কবি আর কবি-মানুষের মধ্যে নিত্য অসঙ্গতি।

মাঠ পেরিয়ে ছোট শহরের কাছাকাছি এসেছি। দূরের আলো চোখে পড়ছে। পথ আর বাকী নেই।

ওই হাতঘড়িটার কথাই ভাবছিলাম। স্বামীজির জীবন-বৈরাগ্য এসেছে, কিন্তু বস্তু-বৈরাগ্য আসা কি এতই সহজ? অথচ আমার নিজের মধ্যেই বা অসঙ্গতি কম কোথায়? আমি পরিব্রাজক, সুধু দেখে যাবো; পর্যটক নই যে, সংশয়ের কষ্টিপাথরে বিচার করব। আমার কাছে স্বামীজি আর হাত ঘড়ি—দুটোই দ্রষ্টব্য।

বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে আমাদের মোটর চলেছে দ্রুত গতিতে। পথের দুইধারে দূরান্তরের প্রান্তরে-প্রান্তরে নতুন বসন্ত-কাল মায়া বিস্তার করেছে। এপাশে ওপাশে ছবির পর ছবি ফুটছে, আবার পিছিয়ে পড়ছে নূতন ছবির আবির্ভাবে। দ্রুতগতির দোলায় দুলছে মন, দুলছে আমাদের কল্পনা।

শালের জঙ্গল পেরিয়ে একটি পায়ে চলা পথ কোথায় যে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ সেইদিকে চেয়েছিলুম। সময় ও দূরত্ব মনেরই বিকার—অভ্যস্ত মন নিয়ে ওদের অস্তিত্বকে স্বীকার করি মাত্র; যে-কাল অনন্ত, যার আদিও নেই, সে কেবল আমাদের মনের একটি পলকের ইতিহাস। পথটি হারিয়ে গেলে,—যেমন চোখে চোখে যাকে রাখি বড় সহজে সে হারায়। কাল ও প্রসার কেবল মনেরই নাকি অনুভূতি।

কাঁকর আর পাথরে ভরা মাঠ,—তারই তরঙ্গায়িত চিত্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে কল্পনা, পিছনে পিছনে চলেছে বৈরাগী প্রাণ,—নিত্যবৈচিত্র্যের ঘন আস্বাদে ক্ষুধা যার মেটে না। অদূরের নীলাভ পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশ নীল, তার মধ্যাহ্ন সূর্যের তাম্রপাংশুল অগ্নিরশ্মির ফলায় বায়ুমণ্ডল ছিন্নভিন্ন হচ্ছে,—আর বাতাসে চৈত্রমাসের ঘুমজড়ানো আতপ্ত নিশ্বাস। আমাদের মোটর রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।

ট্রেনে অথবা মোটরে দেশদেশান্তর অতিক্রম করা চলে, চোখ-বুলানো অনুভূতি একটা আয়ত্ব করা যায়,—কিন্তু ভ্রমণ তখনই সার্থক যখন তার গতি মন্থর। তখন আমরা কেবল দেখেদেখে পথ হাঁটিনে, কিছু পেতে চাই, সংগ্রহে আমাদের মন ভ'রে ওঠে। ভ্রমণকে অবকাশময়, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বভার মুক্ত, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন না করলে তার স্মৃতি থেকে রস টানা যায় না। সেই জন্য কন্‌সেসন টিকিটে বায়ুপরিবর্তন হয়, কিন্তু ভ্রমণ হয় না।

ঢেউ খেলানো পথ বললে হয়ত ছবি ফোটে না, সম্মুখের পৃথিবীর পথ যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আমাদের মোটরের আগে আগে চলেছে। গাড়ীর গদির গর্ভে সেই তরঙ্গ-দোলায় যেন মদির-স্বপ্ন কুমারীর প্রাণকোরকের মতো উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। জানি এ কল্পনা অলস, তবু নিরুপায় প্রশ্রয়ে পথে পথে মন মোহগ্রস্ত। নিকটে দূরে কোথাও গ্রাম দেখা যায় না, জন-মানব কোথাও নেই, চারিদিকের পার্বত্য প্রান্তর ধূ ধূ নির্জন—দূর শূন্য থেকে মাঝে মাঝে উড্ডীন কোন কোন যাযাবর পাখীর আর্তরব,—মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় যে আদিম বন্যতা ছিল এদিকে যেন তার পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের মোটর চলেছে রাঙা পলাশের বন্যা পেরিয়ে।

এখন বসন্তকাল।

ছোট ছোট পাহাড়ের কপাল বেয়ে নেমেছে বাসন্তী রংয়ের

অজস্র ধারা, অরণ্য তার রহস্যের আবরণ তুলে ধরেছে ঋতুরাজের পথে, তারই সঙ্গে চৈত্রের ফুৎকারে ঝরাপাতার ঝরো ঝরো শব্দে বাতাস চলেছে আঁচল উড়িয়ে। পলাশের লালে দিগন্তজোড়া প্রান্তরে আগুন ধরছে। কৃপণের মতো এই উপত্যকাময় প্রান্তর এই সেদিন ছিল রিক্ত, রুগ্ন অরণ্যের শাখা প্রশাখায় নিষ্পত্র নির্জীবতা দেখে গেছি, আজ ঋতুর অজস্রতায় তার শত হাত অকুণ্ঠ প্রসারিত।

বসন্তে এসেছে রং, বর্ষায় আসবে রস।

সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও এই ঋতুর বিবর্তন চোখে পড়ে। সমুদ্রের কল্লোল যারা শোনাতে পেরেছিল, তাদের মন মরুভূমির বালুচড়ায় এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হলকর্ষণ নেই, চাষ চলছে না, সার পদার্থের অভাব, বীজবপন নেই, দিকে দিকে নতুন ফসলের দুর্ভিক্ষ। পুরণো ধান যা গোলাজাত হয়েছিল তাই খরচ ক'রে চলা। নতুন সাহিত্য এখন বসন্ত আর বর্ষা অতিক্রম ক'রে এসে শীত ঋতুতে প্রবেশ করেছে। এর কারণ অস্পষ্ট নয়। যুগের যে দ্রুততা তার ভিতরে মানুষের মনের স্থিরতা নেই, স্থিতিশীলতা নেই। এই সেদিন পর্যন্ত যে সমাজ-চেতনা চলতি ছিল, সেখান থেকে চিত্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাঙা মোটরগাড়ী ঝরঝরে অবস্থার মতো সমাজ-শৃঙ্খলাটা হয়ে উঠেছে হাস্যকর। যৌথ-জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কল্পনায় চিন্তাধারা উগ্র। আগে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত সমাজে একটা যা হোক নীতি ও শৃঙ্খলা ছিল,—এবং তার একটা সুস্পষ্ট আকার ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষনা করা রস সাহিত্যের পক্ষে সহজ হোতো। আগে যৌথ-জীবন প্রণালীবদ্ধ ছিল বলেই তার বিরুদ্ধে সাহিত্যে লাঠালাঠি করা বেমানান হোতো না।

দিগন্তশয়ান অতিকায় সরীসৃপের মসৃণ পৃষ্ঠের মতো পথে

ধাবমান মোটরের ভিতর ব'সে চৈত্রের আতপ্ত হাওয়ায় চোখে নামছে তন্দ্রা। সাহিত্যের কথাই ভাবছিলাম। সম্প্রতি যে-নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে তাকে কি আলস্য বলা চলে? ফল্গুনদীর উপরভাগে তরঙ্গ নেই, বালুরাশিতে সে ঢাকা, কিন্তু তার অন্তর নিরন্তর চলেছে অভিজ্ঞতার পথ ধ'রে বিস্ময় থেকে বিস্ময়ে। সাহিত্যের এক এক যুগ কখনো অন্ধকারে হাতড়ায়, কখনো বা আলোয় দিশেহারা হয়। আপাত নিশ্চলতার ভিতর দিয়ে সঞ্চয় আর সংগ্রহ চলেছে অবিশ্রান্ত, স্রষ্টামন কখনো ব'সে থাকে না। আজ যাকে মরুভূমি বলে ভুল করছি, প্রাণক্ষেত্রের ভূ-তাত্ত্বিক নিয়মে আগামীকাল তাই হয়ে উঠতে রসপ্লাবিত সমুদ্র।

সন্দেহে, অবিশ্বাসে, অশ্রদ্ধায় পৃথিবীর চেহারাটা দুঃখবাদে ধূসর। নতুন সৃষ্টি নেই, কিন্তু দিকে দিকে প্রচলনের বিপক্ষে বিপ্লব আর ভাঙন। কিন্তু তা হোক, আমাদের এই নবগঙ্গার তীরে তীরে যদি আশাবাদের স্বপ্ন দেখি সে কি হবে এতই বড় বিদ্রুপের বস্তু? দুঃখবাদের ভিতরে দেখি বিপুল মরণের ছায়া, তার ক্ষয়-ক্ষীণ হতাশার দিকে চেয়ে থাকলে ভয় করে, সে বিপ্লব যেন আত্মদ্রোহিতা,—সৃষ্টি সেখানেও বন্ধ্যা। বাঁচবার উপকরণ যদি পাই, যদি কল্পনাকে সজীব আর ঐশ্বর্যময় করে তোলে তবে আশাবাদ মন্দ কি? আশাবাদের সহচারী হোলো গতিশীলতা, সহকারী হোলো নতুন অধ্যবসায়। সাহিত্যের তলায় রয়েছে চিত্তবিপ্লব কিন্তু সে যেন কালবৈশাখীর ঝড়ঝঞ্ঝা, তারপরে আসবে নব আষাঢ়ের বর্ষণ।

কথা সাহিত্যে পদ্ধতি আর প্রকাশের বৈচিত্র্য এসেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পটা সেই পুরণো। এ যেম নতুন থালায় বাসি ভাত খাওয়া। বাইরেটা নিয়ে হৈ চৈ করা, কিন্তু তার ভিতরে প্রাণীন পদার্থ নেই। এ কেন? এর কারণ যে-জীবনটা জানি তারই পুনরাবৃত্তি বারম্বার চোখে পড়ছে, আজ আমাদের সমাজে এক

মানুষ অপরের অনুকরণ। সাহিত্যের গতিশীলতা বাধা পাচ্ছে বলেই প্রগতি সাহিত্য নিয়ে এত চীৎকার। সাহিত্যিকরা একদিন তাদের পায়ে শিকলের সুদৃঢ় বন্ধন অনুভব করেছিল, সেই শৃঙ্খল চূর্ণ হবার শব্দ পেয়ে হাততালি দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর দেখা যাচ্ছে পায়ের শিকল কাটলেও সদর দরজায় সরকারী শিলমোহর আঁটা। ভিতরে হোলো সমাজ বিদ্রোহ, বাইরে হোলো মুক্তি আন্দোলন। আজ সাহিত্যিকদের মন ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত। কেউ ফেলছে অশ্রু, কেউ মাথা ঠুকছে বার বার, কেউ উচ্চকণ্ঠে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করছে, আবার কেউ বা রাঙ্গায় চোখ। বিশ্ব-যাত্রার ক্ষুধা যখন জাগলো, শক্তি যখন আয়ত্ব করা গেল, তখনই হোলো সকল পথ রুদ্ধ। জীবনের বহুমুখীনতা বাইরে থেকে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে কিন্তু বাহির হবার পথ নেই।

উচ্চ মালভূমি পেরিয়ে আমাদের মোটর অরণ্য উত্তীর্ণ হয়ে নীচের দিকে নামছে। বাঁ দিকে উচ্চ অরণ্যময় পার্বত্য ভূভাগ আর দক্ষিণে শত শত হাত নীচে বিশাল সমতল উপত্যকা। ছোট ছোট জলাশয়ে, ছোট ছোট গ্রাম আর বনভূমিতে গৈরিকবর্ণ সমগ্র ধলভূম চিত্রপটের মতো আঁকা। মোটর এঁকে বেঁকে চলেছে। মাঝে সহসা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, যেন জানিয়ে গেল এখানকার শ্রাবণেব বিষণ্ণ দিনগুলি কী গভীর অর্থে ভরা। তারপর এলো শরৎ, আলো-ছায়ার দোলায় আকাশ দুলিয়ে চলে গেল। স্নিগ্ধতর বাতাস লাগছে চোখে মুখে।

পৃথিবী সুন্দর, মানুষ হয়তো বা আরো অপরূপ, কিন্তু সহজ প্রসন্ন জীবন যারা যাপন করতে পারল না তাদের চেহারা আজ কেমন? রাষ্ট্রীয় নির্বুদ্ধিতা আর নির্বোধ নেতৃত্বের উৎপাতে বাংলাদেশে আজ জর্জর, কিন্তু তার মর্মের চিত্র আরও ভয়াবহ। স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের পথ না পেলে অগ্রসরবাদী বাঙ্গালী যৌবনের কী করুণ বিকৃতি ঘটতে পারে তার প্রমাণ ত দেখছি

আধুনিক গদ্যকবিতায়। ওদের মধ্যে গদ্যও নেই, কবিতাও নেই, আছে শব্দবাহুল্যের ফেনায়িত নিষ্ফলতা। অর্থের প্রয়োজন নেই অনর্থ কিছু একটা ঘটলেই ওরা খুশি। উচ্চশিক্ষা আর প্রতিভার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, ওদের বিদ্যার মধ্যে এই সত্য নেই; সেই কারণে শব্দ-পাণ্ডিত্যের আবরণে ওরা শক্তির দৈন্য ঢাকতে চায়। ওদের অপরাধ নেই, কারণ বাঙ্গালী জীবনের মূলে রয়েছে বেকারের অসন্তোষ। কর্মহীন দরিদ্র বেকার যখন গদ্য কবিতা লেখে তাকে কাজ দিয়ে সৎপথে আনা সহজ; কিন্তু সম্পদশালী ধনী বেকার অথবা বেকার পণ্ডিত যখন অর্থহীন শব্দের বুদ্‌বুদ্‌ ফোটায় তখনই সন্দেহের কারণ ঘটে। তারা পাঠক ভোলায় না, ভোলায় নিজেদের। নিখুঁত উন্মাদের অভিনয় করে বলেই অনেকে ওদের বাহবা দেয়, ওরা মনে করে ওই বুঝি প্রতিভার নগদ বিদায়। গদ্যকবিতা যে নিন্দনীয় তা বলিনে,—অর্থসঙ্গতি, ভাবব্যঞ্জনা আর রসাত্মক বাক্য যে আকারেই আসুক না কেন তাকেই কবিতা বলবো। কিন্তু অচেতনার অসংলগ্ন প্রলাপে আধুনিক গদ্য কবিতা পাগলা-গারদের কথা স্মরণ করায়।

নির্জন পার্বত্যপথ। সেই পথের শাখা-প্রশাখা ছোটনাগপুরের নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে। মাঝে মাঝে বনবীথিকার মধ্যে তাদেরই শিরা উপশিরার ন্যায় পায়ে চলা পথরেখা শাল-পলাশের বাঁকে বাঁকে হারিয়ে গেছে, প্রাণ যেন চলে তারই পিছনে নিরুদ্দেশ লক্ষ্য নিয়ে।

দেখতে দেখতে দিনান্তকালের সূর্য অস্ত গেল, আমাদের মোটর আবার ঘুরে এলো পূর্বদিকে। ছোটনাগপুরের আকাশ আর উপত্যকা বর্ণের আড়ম্বরে বিচিত্র হয়ে উঠলো। তারই ক্ষীয়মান রশ্মিজাল সম্পূর্ণ লুপ্ত হবার আগে শুক্লপক্ষের চন্দ্র এসে হাজিরা দিল। সমস্ত দিগন্তভরা অস্তগত সূর্যের আভার সঙ্গে মেলানো শুক্ল একাদশীর জ্যোৎস্না। আমাদের মোটর

দ্রুতবেগে চলেছে। আমরা রামগড় থেকে ফিরে চলেছি রাঁচীর দিকে।

কথায় কথায় পুনরায় প্রগতি সাহিত্যের দিকে নেমে এসে-ছিলুম। ভাবীসাহিত্যে বাস্তববাদ কতখানি থাকবে, রোমান্টিক মেজাজকে সমাধিস্থ করা হবে কিনা, জীবনকে আরো রূঢ় আরো সত্য ক'রে প্রখর আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ব্যাখ্যায় আর বিশ্লেষণে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা প্রয়োজন,—মনে মনে এ তোলাপাড়াও ছিল। ভাবছিলাম জীবনের সর্বাঙ্গীন বিরাটত্বের যে রিয়লিটি তাকে প্রকাশ করাই বড়, না, ভাবীকালের জীবনকে যুক্তি ও বাস্তববাদের ভিত্তিতে নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রে নেওয়াই প্রগতি সাহিত্যের পরম লক্ষ্য ?

কিন্তু এর মীমাংসা হবার আগেই বন্ধুরা সহসা মোটর থামালেন। প্রায় কুড়ি মাইল এসেছি, শুক্ল একাদশীর জ্যোৎস্নায় সমগ্র ধলভূম পরিপ্লাবিত। মনে করেছিলুম দিকদিগন্ত নীরব, কিন্তু তা নয়, ঝিল্লির ঝনকঝঙ্কারে চারিদিক মুখর। চন্দ্রের দিকে চোখ তুলতে গিয়ে দৃষ্টি চ'লে গেল আরো ঊর্ধ্বে, আকাশের হৃৎপিণ্ডের দিকে। সহসা মনে হোলো মহাকাল চলেছে তার দুরন্ত পাখার ঝাপটায় ঝড় তুলে যুগ থেকে যুগান্তরে, তার অন্ত নেই, তার অবধি নেই। নিত্য পরিবর্তন আর বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেই কাল-ভৈরবের শাসন চলেছে দুর্দান্ত তাড়নায়। আমরা শিশুমানবক, আমরা তার পথের দিকে চেয়ে থাকি, আর বুকের মধ্যে শুনি পলকে পলকে তার পাখার ঝাপট।

নিশ্বাস ফেলে আবার মোটর ছুটলো। রাঁচী শহরে এসে পৌঁছালাম রাত আটটা।

মাত্র চব্বিশ মাইল জলপথ। আমাদের স্টীমার চলেছে মন্থর গতিতে। যাত্রীর সংখ্যা অল্প, নিকটে ও দূরে ডেক-এর উপর জনকয়েক ছড়িয়ে শুয়ে নিদ্রামগ্ন। রাত্রিশেষের একটা আভাস পূর্ব গগনে দেখা দিচ্ছে অল্প অল্প। চেয়ে দেখছি স্টীমারের দোলার সঙ্গে আকাশের অগণ্য নক্ষত্র টলটল করছে। ওদের নিঃশব্দ আলোকবিন্দুগুলি আমার মুখে ছায়া ফেলছে ক্ষণে ক্ষণে। আমার উড়ো চিন্তার ওরা নির্বাক শ্রোতা।

আলাপ একটা চলছে নিজের সঙ্গে। নদীর উপরে তরঙ্গ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, উৎক্ষেপ নেই, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার আছে একটা কল্লোল, নিজের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া। যাকে বলে গতি তার সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। বাইরের পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে আমার প্রাণের আছে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা, সেই কথাটা জলের উপর দিয়ে যেতে যেতে যেমন অনুভব করি এমন আর কিছুতেই না। আমার স্থির থাকার উপায় নেই এইটিই সত্য, দাঁড়ালেই থেমে যেতে হবে, ক্লান্তি এলেই চরম অপমৃত্যু।

অনেক সময়ে অনুভব করেছি,—যেমম এই রাত্রি শেষের আকাশ আমার কানে অনেক সময়ে অদ্ভুত ভাষায় কথা কয়,—আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা অন্ধ, নিগূঢ় চৈতন্য ধক ধক করে। বলে—সময় নেই, সময় নেই, তোমাকে শেষ করতে হবে সব। এই আত্মতাড়না দেয় আমাকে গতি, ছুঁইয়ে দেয় অনন্ত আশার স্পর্শ, দুই পায়ে এনে দেয় অফুরন্ত প্রাণশক্তি। মানুষের সকল

কাজের পিছনে কেবল কি আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মপ্রকাশের ব্যগ্রতা? হয়ত এমন হতে পারে, মৃত্যুভয়ই মানুষকে সকল কর্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত করে—কে জানে।

নির্জনতা আমার প্রিয়, কিন্তু কবিজনোচিত নির্জনতা নয়। মানুষকে এড়িয়ে, জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোন একটা নিরুদ্দেশ নির্জনতা নয়,—বিপুল জনতার দলাদলির ভিতরে নিজেকে একান্ত ক'রে দেখি, আমি জনহীন। বন্ধুদের আড্ডায়, রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে, সংবাদপত্রের আপিসে, সাহিত্যসভার কচকচির মধ্যে আমি বারম্বার অনুভব করেছি অতিশয় একাকী, আমি যেন তখন আপন প্রাণের দর্পণেই নিজের প্রতিফলিত চেহারাটার দিকে একান্তভাবে চেয়ে থাকি। দেখছি, আমি যা চাইনে তাই আমার হাতে আসে, যাকে সহ্য করতে পারিনে তার কাছেই কাজকর্মের আদানপ্রদান, যে কাজকে অপছন্দ করি সেই কাজেই দিন কাটে, এবং যেখানে যেতে মন চায় না—মনের অগোচরেই আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে হয়।

নিজের সত্য পরিচয়? কিন্তু সে কি আমার কৃতকার্যের মধ্যে পাওয়া যাবে? আমার পরিত্যক্ত স্তূপীকৃত কর্মসম্ভার কি আমার সত্য পরিচয়ের উপকরণ? আমি নিজে যেন কোন্ এক প্রতিভাশালী গ্রন্থকারের পাকা হাতে লেখা একখানা কাঁচা উপন্যাস। বিষয়বস্তুটা মন্দ ছিল না, গল্পের প্রবাহটাও ছিল প্রচুর কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর ত্রুটিতে হয়ে গেল সব মাটি। আমি যা হতে চেয়েছিলাম অথচ হয়ে উঠতে পারিনি সেই আমার সত্য রূপ— এ কথা কেউ অস্বীকার করবে?

একটা আইডিয়ার মধ্যে, হৃদয়স্বপ্নের মধ্যে আমার সত্য মানুষটা বাস করে, কিন্তু জগৎসংসারের অসংখ্য অসঙ্গতির মাঝখানে সে যখন এসে দাঁড়ায় তখন তার নকল পোষাকটার ভিতর দিয়ে সত্য চেহারাটাকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। হয় সে

তখন নিজেকে গোপন করে, নয়ত বা আত্মপ্রকাশের পদ্ধতিকে সে জটিল ক'রে তোলে।

কথার পর কথার মালা গেঁথে চলেছি নির্জনে। শব্দের পর শব্দ, কোটি কোটি প্রাণহীন অক্ষর—নির্বোধ নির্বাক নিশ্চল অক্ষরের অরণ্য, সমুদ্রের অগণ্য ঝিনুকের মতো,—কিন্তু নির্মমভাবে নিজেকে জানতে পারিনি, নিরাসক্ত হয়ে নিজেকে জানাতেও পারিনি।

কেন? কোথায় আছে নিষেধ? কোথায় ঘরগড়া নীতির বাধা?

অনেকটা যেন অজানার দিকে যাত্রা। সঙ্কীর্ণ নদীপথ, উষার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পাচ্ছি আঁকাবাঁকা নদীপথের দুই তটে গ্রামের পর গ্রাম,—কোথাও ভগ্ন তটের বাঁক, কোথাও প্রাচীন বটের শিকড়ের ভিতরে নদীর প্রবাহ প্রবেশ করে ক্ষয় করে এনেছে। কোথাও এরই মধ্যে গ্রামের দুই একটি নরনারী নদীতে অবগাহন সুরু করেছে। দেখতে দেখতে প্রভাতের রক্তিম আলো আকাশে ফুটে ওঠে।

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, প্রত্যহের জীবনযাত্রায় যে পৃথিবী রূপকের রাজকন্যার ন্যায় রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে চোখ মেলে জেগে উঠেছে, আমি যেন তার একমাত্র দর্শক। আমি বিছিন্ন, নির্লিপ্ত বর্তমানের সমস্ত দৃশ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে আমি যেন অতি দূরে সরে আছি। এই স্টীমার, এই নিদ্রিত যাত্রীর দল, দূরে ওই গ্রামের পর গ্রাম, প্রভাতী পাখীর বন্দনা-গান, অস্পষ্ট নদীর রেখা—সমস্তই স্বপ্নবৎ, সমস্তই যেন আমার মনশ্চক্ষের সৃষ্টি। আমি এদের সকলকে নিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট পথে, কোন্ অজানা জীবন ও মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছি, কোন্ পরম পরিণতির দিকে। আমি যেন এদের পথপ্রদর্শক, এদের ভাগ্যবিধাতা।

জীবনযাত্রার অর্থ কি? জীবনের সমস্ত উপকরণ নিয়ে মহাজীবনের দিকে যে-অভিযান তাকেই বলবো মানুষের পরমায়ু। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, দেশ থেকে মহাদেশ, সহস্র জনপদ, অগণ্য নদীপথ, তুষারাচ্ছন্ন গিরিশিখর, নরখাদকের রাজ্য, হিংস্র শ্বাপদের অরণ্য, অনাবিষ্কৃত মেরুদেশ,—তারপরে আরো দূরে, হারিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া,—একটা অনাস্বাদিত বন্য বর্বর জীবন। জীবনযাত্রা কি এর নাম নয়?

ইতিহাস তাদেরই জন্য, যারা কেবলমাত্র বাঁচেনি, কেবলমাত্র মরেনি। ঈশ্বরের রাজটীকা কপালে নিয়ে জন্মেছে তারা, যারা গোমুখীর মুখ থেকে উৎসারিত হয়ে জনপদ প্লাবিত করে ছুটে চ'লে গেছে গঙ্গাসাগরের দিকে। ঘরগড়া নীতির যারা দাসত্ব করেনি, সমাজপতির ভ্রূকুটি যাদের বিজয়যাত্রার পথকে কণ্টকিত করেনি, চলিত অবস্থার দাসত্বকে যারা স্বীকার ক'রে নেয়নি। অন্তত আমার মতো, যারা কোনো হৃদয়বৃত্তিকে আমল দেয়নি, বৈরাগ্য যাদের রক্তে, যারা মানুষের নির্বোধ আদর্শের দিকে চেয়ে কেবল হেসে যায়। অন্তত আমার মতো যাদের মনে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করার কল্পনা।

স্টীমার ভেসে চলেছে, পৃথিবী হেসে চলেছে। নদীর দুই তীরে বাংলার গ্রাম্য জীবনের একটি সরল স্বভাবসৌন্দর্য।

আমি ব'সে ব'সে ভাবছি প্রভাত আকাশের দিকে চেয়ে। আমি ভাবছি আমার পথ যেন কোনদিন না ফুরোয়। স্টীমার হেলে দুলে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলেছে,—আর আমি চেয়ে রয়েছি আমার ভিতরকার নদীর অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের দিকে।

আমি চেয়ে রয়েছি প্রভাত সূর্যের দিকে, ডুবে গেছি আকাশগঙ্গায়।

এক শ্রেণীর লোক নালিশ জানায়, পশ্চিমবঙ্গে নাকি দেখবার কিছু নেই। এখানে না আছে শ্বেত পাথরের তাজ, না লালকেল্লা, না আকাশ-ছোঁওয়া গোপুরম্, না বা অম্বরের রাজপ্রাসাদ। কেউ যদি চোখ, মন আর স্বাস্থের খোরাক পেতে চায়, তাকে নাকি যেতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। কলকাতাকে বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের আর থাকে কি।

কিন্তু যা থাকে তারই জন্য ছুটে আসে জগতের নানা দিকের লোক। সভ্য জাতির প্রতিনিধিরা এখানে এসে কী দেখে যায়, সে তারা জানে বৈকি।

ভারতবর্ষের আশ্চর্য জগতে ঘোরাফেরা করে এসে পশ্চিম-বঙ্গের মাটিতে পা দিলেই অনুভব করা যায়, এখানে ভারতবর্ষের আধুনিক কালের উদ্বোধন ঘটেছে। ভারতবর্ষের এই পূর্বাঞ্চল হল পলিমাটির দেশ—অত্যন্ত উর্বর, কিন্তু অত্যন্ত চটুল।

এককালের সৃষ্টি জীর্ণ হতে থাকলে অন্যকালের পলিমাটি এসে তাকে চাপা দেয়। তাই জন্য এখানকার মাটি যে শুধু নিত্য সৃষ্টিশীল তাই নয়—নিত্য ক্রিয়াশীলও বটে। মাটি এত নরম বলেই মাটির তলায় বসে গেছে সকল কালের পুরাকীর্তি।

মৌর্য, গুপ্ত ও পালবংশ—এই তিনটি স্বর্ণযুগের চিহ্ন যদি বা কোথাও থাকে, তাদেরকে খুঁজে পাওয়া ভার। এককালের প্রতাপশালী গৌড়কে জয় করেছিল বখ্‌তিয়ার খিলিজি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে,—তারপর থেকে তিন শ' বছর ধরে তাদেরই

দলবলের হাতে চলল পাঠান রাজত্ব—কিন্তু আশ্চর্য, তাদের সেই সব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে ঐতিহাসিক ছাড়া কেউ মাথা ঘামায় না। হয়ত বা কোথাও কোথাও বিশমহলা স্মৃতিস্তম্ভ কিংবা সমাধিমন্দির এখনও দাঁড়িয়ে পর্যটকের পথে হাতছানি দেয়,—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মন ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিয়ে কখনও একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং আজকে কোথায় তৈরী হল একটি বিজ্ঞান কলেজ কিংবা একটি সেরামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট—বাঙ্গালীর স্বাভাবিক সন্ধিৎসা তখনই সেখানে ঝুঁকে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ চিরদিনই সকল বিষয়ে অগ্রসর, এবং অনেককে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়,—একথা বললে আশা করি খুব বেশী প্রতিবাদ উঠবে না।

কথিত আছে, মহাবীর আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের 'গঙ্গারিদাই' তথা গাঙ্গেয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চার হাজার হাতি নিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেন, গ্রীকরা এদৃশ্য কখনও দেখেনি। তাদের সৈন্যসামন্তরা ভয়ত্রস্তভাবে পালাতে থাকে। বাঙ্গলার এই অপরাজেয় প্রাণশক্তি প্রকাশ পায় পাল রাজা ও সেন রাজাদের আমলেও,— যখন বাঙ্গালী শিল্পী ও ধর্মপ্রচারকরা দক্ষিণের সমুদ্র এবং উত্তরের হিমালয় পেরিয়ে চলে যায় দেশ দেশান্তরে। কেউ যায় শিল্পকলা বিদ্যা নিয়ে, কেউ বা যায় ধর্মসংস্কার অভিযানে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এসে দেখি নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ —এরা হল পশ্চিমবঙ্গের সত্যকার গৌরব। ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকে এরা যেন প্রথম নতুন বার্তা নিয়ে আসে। ভারতে মোগল আক্রমণকালে শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় যখন ভক্তি প্রীতি ও ভগবৎবিশ্বাসের বন্যা বইতে থাকে, তখন বহুসংখ্যক মুসলমান শ্রীচৈতন্যের সেই আন্দোলনে যোগদান করেন।

মুর্শিদাবাদ যখন গৌরবের শীর্ষে আসীন, তখন দেখি নবাব সিরাজের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা হলেন হিন্দু বাঙ্গালী। মুসলমান বাউলের দেহতত্ত্ব সঙ্গীত শুনে আজও পশ্চিমবঙ্গের চোখে জল আসে। সিরাজ সম্বন্ধে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আজও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে।

পরবর্তী কালে রাজা রামমোহন এনেছিলেন একটি নূতন সংস্কৃতি। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নিয়ে তিনি একটি সংহতি ও সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন—যার ফলে দেখেছি উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় গির্জা ও মন্দিরকে ছেড়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারপরে আবার এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—গঙ্গা যেমন এসে মিলেছেন গঙ্গাসাগরে। তাঁর মধ্যে দেখা গেছে সকল মত, সকল পথ, সকল ধর্মের ধারা,—এক বিরাট সংহতি লাভ করেছে। প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতের মানবতার এত বড় মুখপাত্র কোনওদিন আবির্ভূত হননি।

পশ্চিমবঙ্গে ঘুরতে এসে যদি কেউ কলকাতার চৌরঙ্গী আর চিড়িয়াখানা, যাদুঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন আর বেল্‌ভেডিয়ার, কিংবা ফোর্ট উইলিয়ম আর ডালহাউসী দেখে ফিরে যায়, তারা ভুল করবে। কলকাতা হল নতুন, দুশো আড়াইশো বছরের বেশী নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অনেককালের পুরনো। এ প্রদেশকে দেখতে গেলে গায়ে কিছু ধুলো মাখতে হয়। গিয়ে বসতে হয় বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে, শান্তিনিকেতনে, রাধানগরে, নবদ্বীপে, তমলুকে মুর্শিদাবাদে। বাঁকুড়া, বর্ধমান, মালদা, দিনাজপুর,—এদের আশে-পাশে অগণিত ইতিহাসের শুকনো পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে বহুকাল থেকে। এই পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ একদা বৃন্দাবনকে খুঁজে বার করেছিল, বিন্ধ্যপ্রদেশকে দীক্ষিত করেছিল, রাজস্থানকে নতুন মহিমা দিয়েছিল, কাশ্মীরে

গিয়ে মন্ত্রিত্ব নিয়েছিল, গোয়ালপাড়া আর আসাম ছাড়িয়ে মণিপুরে গিয়ে নবতন, সংস্কৃতির পত্তন করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদের অধিকারে পশ্চিমবঙ্গ গিয়েছে বহুবার। পাঠান, মোগল, ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ—এরা ছাড়াও ওলন্দাজ ও ডেনিশ বণিকের দল এসে জায়গা নিয়েছিল। আজ তারা নেই, পলিমাটির তলায় তারা চাপা যাচ্ছে একে একে। কিন্তু নতুন কালের ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি জাতির গুণীরা এসে জায়গা পাচ্ছে সংগঠনের কাজে। শুধু পাশ্চাত্য নয়,—প্রাচ্যের থেকে চীনা, বর্মী, নেপালী, তিব্বতী, লেপচা, ভুটিয়া, কাশ্মীরী, আফগানী, পাকিস্তানী,—এরাও রয়েছে নির্বিঘ্নে পাশাপাশি। পশ্চিমবঙ্গের নবতন সংগঠনের কাজে যে বিরাটতর কর্মচাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে,—এরা কেউ তার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নেই।

যদি কোনও পর্যটক হঠাৎ এসে পৌঁছেন পশ্চিমবঙ্গে,—তবে তিনি বাঁদী-বেগম আর নবাব-বাদশাদের প্রাচীন বিলাসভবন বেশী সংখ্যায় দেখতে পাবেন না বটে। কিন্তু ঘুরে যেতে পারবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বোস ইন্স্টিটিউট, বিজ্ঞান মন্দির—প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্র,—যেখান থেকে আধুনিক শিক্ষিত ভারত গৌরব লাভ করেছে। সাহিত্যের পাড়াতেও তিনি একবারটি ঘুরে যেতে পারেন,—যেখানে ইতিহাস বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, লোকসাহিত্য—ইত্যাদি বিষয়ে ভারত একালে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছে। ওই সঙ্গে তিনি যদি বাঙ্গলার কাব্য ও রস-সাহিত্যের সমাজে একবারটি উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে যান, তাহলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের রসসাহিত্যলোকে আজ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষণ, প্রকাশভঙ্গী ও অনুসন্ধান চলছে,—সভ্যজগতের যে কোনও দেশের সাহিত্যের সঙ্গেই তার তুলনা চলে। বাঙ্গলা সাহিত্যের মতো এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যে আর কোনটা আনেনি।

এই প্রদেশের আলোচনা করতে গিয়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের কথা সহজেই আসে। আমাদের চেনা জগতের সীমানা সত্যই একটু সঙ্কীর্ণ,—অজানা আর অচেনার পরিমাণ অনেক বেশী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বহু অঞ্চলে হয়ত আজও সভ্য মানুষ বাসা বাঁধেনি। বন্যনদী, পাহাড়তলী, সঙ্কোশের আনাচকানাচ, তরাইয়ের অরণ্যলোক, টোটোবস্তির পাড়া, ভূটানের দক্ষিণাঞ্চল,—এরা পর্যটকের উদ্দীপনাকে ডাক দেয় বৈকি। দার্জিলিংয়ের কথা বলাই বাহুল্য, —এটি যেন পশ্চিমবঙ্গের চূড়ামণি। রোমাঞ্চ কৌতুকের এমন ক্ষেত্র কমই আছে। টাইগার হিল্ থেকে শেষে রাত্রে সূর্যোদয়ের দৃশ্য, সন্দকপু থেকে গৌরীশৃঙ্গ, অবসারভেটরী থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ঘুম-এর বৌদ্ধগুম্ফা, বার্চহিল্ আর জলাপাহাড়ের আড়ালে আবডালে বনভোজন, লেবংয়ের মাঠ,—আরও কত বিবিধ আকর্ষণ।

আবার ইতিহাস নিয়ে বসলে দেখা যাবে কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, শিবপুরের বাগান, ময়দানের সেণ্টপলস, ডালহাউসী আর দমদমার ওদিকে লর্ড ক্লাইভের প্রাচীন আড্ডা, বেলভেডিয়ারের বাগানের কোনে হেস্টিংসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র,—কিম্বা দেখিয়ে দেবো ফরাসী, ওলন্দাজ অথবা ইংরেজ মিশনারীর প্রথম আমলের কীর্তিস্থল, অর্থাৎ চুঁচড়ো হুগলী শ্রীরামপুর ইত্যাদি। বহুকালের ইতিহাসের ছোটবড় নানা টুকরো পশ্চিম-বঙ্গের সর্বত্র ছড়ানো,—কিন্তু হয় আজ তারা পলিমাটির তলায় চাপা পড়েছে, আর নয়ত নীলকুঠির পরিণামের মতো আগাছার জঙ্গল তাদেরকে চিরকালের মতো গ্রাস করেছে।

সব শেষে দেখিয়ে দেবো পশ্চিমবঙ্গের জ্ঞান ও বিদ্যার পুণ্য তীর্থক্ষেত্র শান্তিনিকেতন—যেখানে আধুনিক ভারতের সর্বশেষ মহাকবি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিদ্যাসাধনাকে মিলিয়ে ছিলেন তপস্বীর মতো।

কাব্য সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা, কারুশিল্প,—এইখানে এসে এতকাল পরে যেন পরমার্থ লাভ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি চিরদিন ধরে যে সংহতির মন্ত্র জপ করে এসেছে, শান্তিনিকেতনের আনন্দময় পরিবেশ যেন তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এই সেদিন অবধি ভারতের জাতীয়তাবাদের যজ্ঞে পশ্চিমবঙ্গ ছিল যেন আচার্যের মতো,—ভাবসাধনায় আর মন্ত্ররচনায় সে এনেছিল দেশব্যাপী উদ্দীপনা।

আজ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটা ভিন্ন।

কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার এসে পৌঁছেছে তার লোকজীবনে। জড়তা, আলস্য, বিতর্ক, কুসংস্কার—এদের ঘুচিয়ে অচলায়তনকে সরিয়ে মুক্তধারা নেমে এসেছে।

বন্যা এসেছে নতুন পলিমাটি নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সময় এগুলি আজ কারো চোখ এড়ায় না।

শীতকালের উৎসবগুলো বড়দিনকে কেন্দ্র করেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। বড়দিনকে বড় ক'রে দেখার হয়ত কারণ আছে,—সেটা খৃষ্টজন্মের কাল। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রের দিনে যদি যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করতেন, তবে এত উৎসব হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতো না। এর পক্ষে যুক্তি হোলো, শীতের দিনে কায়িক অধ্যবসায় থাকে প্রচুর, শরীরের রক্তে তেজ বাড়ে,—তখন এক উৎসব থেকে অন্য উৎসবে ডিঙিয়ে বেড়াতে ভালো লাগে।

সামাজিক পর্ব বল্যে, কংগ্রেস বলো, রাষ্ট্রিক আন্দোলন বলো, শীতের দিনেই জমে বেশী। পোষাকে, আহারে, বিহারে, নাচে-গানে, উৎসবে, তামাসায়—শীতটা ঘোরালো। এটা কমলালেবুর মাস, লেবুর রক্তাভা ফুটে ওঠে মেয়েদের গালে, ওর ঠাণ্ডা মধুর রসে ছেলেদের মনে আসে উদ্দীপনা। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ খুবই স্পষ্ট। শীতের হাওয়ায় গাছপালা শুকিয়ে ওঠে, ভিতর থেকে রস যায় মরে—আসে একটা দিগন্তব্যাপী জড়তা। আগামী বসন্তের তপস্যায় আধমরা শীত যেন পাংশুল আবরণে জড়িয়ে হি হি করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু মানুষ এগিয়ে যায়, শীতের চাবুকে তার রক্তে আসে জোয়ার, জড়তার গর্ভ থেকে উঠে উজ্জ্বল রৌদ্রে সে দুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে দিক থেকে দিগন্তরে। রক্তে তার নেশা লাগে ভ্রমণের, জয়ের, দুরাশার ও শাসনের।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আলস্যটা মজ্জাগত। দ্বিপ্রাহরিক আহার আর তাকিয়ার গায়ে দিবানিদ্রায় আমাদের হাই ওঠে। আলস্য আর আরামপ্রিয়তাটা অপরাধ নয়। আমাদের দেশে কাজের চেয়ে যে কথা বেশী, তার গোড়াকার কারণই এই। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান এবং গরমে যে কাজ করা অপেক্ষা গান গাওয়া সহজ, শাসনতন্ত্র রচনা করা অপেক্ষা বৈঠকী আলাপ জমানো বেশী প্রিয়—একথা কে না জানে। তাই হঠাৎ শীতের দিনে আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার মূলে যেন একটা কঠিন টান পড়ে। এই দু'মাস শীতের হাওয়ায় আলস্যের প্রতি আসে বিরক্তি, বাতের কনকনানির ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করতে ভালো লাগে।

বড়দিন ব'লে আমোদ নয়, খৃষ্টজন্মের কাল ব'লে উৎসবের আয়োজন নয়,—এ কেবল শীত বলে। পায়ে পায়ে পথে পথে নতুন কাজের উৎসাহ আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে

বেড়ায়, অনেকটা সেই কারণে। কমলালেবুর খোসায় ডিজেম্বরের আস্বাদ এসে পড়ে।

এমন মধুর শীতে যদি প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন না হতো ওর সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো উৎসাহ থাকতো না। শীতের দিনে ওর আসর বসে, তাই অনেকের আকর্ষণ, বিদেশে ওর আয়োজন হয়—তাই অনেককে বারে বারে টেনে নিয়ে যায় বাঙ্গলা থেকে বৃহত্তর বঙ্গে। সাহিত্য-প্রীতির জন্য যারা যায় সাহিত্য সম্মেলনে, তারা নির্ভুল কথা বলে না। কারণ সাহিত্য সম্মেলনে যদি বা গোটা দুই চার ভারি ভারি প্রবন্ধ থাকে সেগুলি 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' হয়ে থাকে—কিন্তু সাহিত্য সেখানে থাকে না। সাহিত্য ঘরের কোনে, মলিন মৃৎপ্রদীপের নীচে উপবাসী মন যদি ভাবনায় বেদনায় দুরাশায় উধাও হয়ে যায়, সেখানে হয়ত দেবী ভারতীর কটাক্ষপাত হ'তে পারে। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন না ব'লে প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলা বললে ভুল হোতোনা। এই মেলায় এসে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা নতুন মানুষ, বাঙ্গলায় তাঁদের দেখ্‌ছি বলে মনে পড়ে না। সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন যেটা বসে, তার চেহারায় যেন নতুন সমাজের হাওয়া, নতুন দেশের সংবাদ। দেখতে দেখতে মন খুশি হয়ে ওঠে। দূরের মানুষ যদি আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ায়, তাদের কাছে যেমন চট করে ঘরকন্নার অভাব অভিযোগের কথা আমরা বলিনে, বলতে মুখ ফোটেনা,—তেমনি প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলায় বাঙ্গালা দেশের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ব্যক্ত করতে মনও ওঠে না। তাঁদের প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে সঙ্কোচ হয়। মনে হয়, থাক—অন্য কথা হোক, তাঁদের জড়ো করে বিদেশের গল্প শুনি। আনন্দ আর নির্ভাবনার পথ ধ'রে নিজেকে ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সাহিত্যের কথা, গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলাপ —এসব সেখানে শুনতে যদি কেউ না চায় তাকে দোষ

দেওয়া চলে না। সাহিত্যের ভালোমন্দ, বিজ্ঞানের প্রগতি, দর্শনের উন্নতি —এদের জন্য বই কাগজ আছে, সাময়িক পত্রের বাজার আছে, কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর মেলা এদের জন্যে নয়, এখানে যেন একজন অপরিচিত বাঙালী আর একজন অপরিচিতকে আবিষ্কার করতে যায়, তাকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ করে, আলাপ করে, সাদর অভ্যর্থনায় অস্থায়ী বাসার মধ্যে নিয়ে গিয়ে অপ্যায়িত করে।

বেশ মনে পড়ছে আগ্রা অধিবেশনের কথা। পৌষের প্রভাতে গিয়ে নামলুম সেণ্ট জন কলেজের প্রাঙ্গণে। তখনও রোদ ওঠেনি। শীতে আড়ষ্ট হয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে স্কুল বাড়ীর একটা ঘরে গিয়ে উঠলুম।

একজন যুবক বললেন, হ্যাঁ, এই ঘরটাই ক্যালকাটা।
দশ বছর আগেকার সেই বিস্ময় আজো মনে পড়ে। ঘরটার নাম কলিকাতা। কলিকাতা বন্দী হয়েছে একটা ঘরে। পাশের ঘরের দেয়ালে আর একটা নাম লেখা, মীরাট! আর একটায়, দিল্লী। তারপর আরম্ভ হোলো, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কানপুর—এমনি ঘরের পর ঘর। একই বাড়ীর মধ্যে অসংখ্য শহর আবিষ্কার! সেই বিস্ময় আমাব মনে এনেছিল এক একটি নতুন ছবি। বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর আশা আর কল্পনা, বাঙ্গালীর আত্মবিস্তার—যেন সমগ্র ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; প্রত্যেক অধিবেশনে যেন সেই মহিমার সংহত চিত্রাবলী। ছোট একখানা ঘর, কিন্তু তার মধ্যে হয়ত পেলুম সুদূর রাজপুতানার আভাস। সেই হরিণ ছুটে চলে বালুময় প্রান্তর পেরিয়ে মরুভূমির অজানায়, সেই ময়ূরের পালকপরা রঙীন ঘাঘরা ওড়ানো নাগরিকার ঘুঙুরের গান। যিনি আলাপ করলেন তিনি হয়ত মেয়ে, হয়ত বা পুরুষ—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। চোখ চেয়ে দেখলুম, তাঁর চেহারায় দিগন্তহীন মরুভূমি আর রাজপুতানার

রহস্য। যশলমীরের দুর্গ আর ধাত্রী পান্নার কাহিনী, সেই রানা প্রতাপের দুর্দমনীয় বীরত্বের ইতিহাস।

সেখান থেকে ফিরে এঘরে এসে দাঁড়ালুম।

—আরে আসুন আসুন, নমস্কার—এবারে এসেছেন তা হলে? কই, আপনি যে বলেছিলেন, লাহোর যাবেন? এলেন না ত?

হেসে বললুম, এঘরটা বুঝি লাহোর?

অজ্ঞে হ্যাঁ, বড়ি ঠাণ্ডা। লাহোরে জল যাচ্ছে জমে।

মনে পড়ে গেল লাহোরের গুলবাগ আর চিড়িয়াখানার ছায়া-ঝিলিমিলি পথ। বাদশাহী মসজিদের পাশ দিয়ে ছোট রাস্তা গেছে কোন্ পল্লী থেকে কোন্ পল্লীতে। শহর কেতোয়ালী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কোন্ পথ গেল কোন্ দিকে; সেই অসমাপ্ত ভ্রমণ আর শেষ হলো না। সামান্য লাহোর, কিন্তু আজ এই সেণ্ট জন কলেজের কক্ষে বসে সেই অসামান্য লাহোরের রহস্যময় পথঘাটের আর কূল কিনারা পাইনে।

আরে, এই যে, এসেছেন আপনি? আ, ভুলে গেছেন বুঝি আমাকে? ঠিক মনে করে দেখুন ত, কোথায় আমার সঙ্গে আলাপ?

হেসে বললুম, ঠিক মনে পড়ছে না।

তিনি বললেন, আমি শচীন সরকার।

চিনতে না পেরে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। ভদ্রলোক পাশে এসে বসে হেসে বললেন, সেই যে, জয়পুরে? মাজি ধর্মশালার ঘরে আপনার সঙ্গে আলাপ—প্রায় বছর চারেক হোলো। আমি চললুম সগোরের দিকে, আর আপনি গেলেন বম্বে,—মনে পড়ছে?

হেসে বললুম, হ্যাঁ, ভালো আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর, বাঙ্গলাদেশের খবর কি বলুন।

বললুম, আপনি এখন কোথায় ?

এই ত কাছে, অমৃতশহরে। চলুন না, এক রাতের পথ।—আরে দাদামশাই যে,—কই দিদিমাকে আনেন নি ? দিল্লীতে শীত কেমন ?

আরে ভায়া,—বলে স্থূলকায় দাদামশায় এলেন এগিয়ে। বললেন, শীতের মালুম ত হচ্ছে আগ্রায়। ভালো আছো ত ?

এমনি করেই আলাপ চলে। একই ঘরে বিভিন্ন দেশ এসে জড়ো হয়। বোম্বাই থেকে এলাহাবাদ, নাগপুর থেকে গোরক্ষপুর, পাটনা থেকে কানপুর। একজন আগন্তুককে দেখছি, তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে অজানা কোন্ দেশের অজ্ঞাত ইতিহাস।

রাঁচির কথা ভাবছি। কত যাত্রী কত দেশ থেকে এলো দলে দলে। কত কণ্ঠে কত কাহিনী। বিবিধ পথের গল্প জমালো হুড্রু প্রপাতের নীচে পাথরের পেটিতে বসে। অধিবেশন একটা আছে বৈ কি, 'সেখানে আধুনিক সাহিত্যের তিল তর্পণ ও শ্রাদ্ধ হয়। তা' হোক, তার চেয়ে এই ভালো। এই অজানা সাঁওতালী পাহাড়ের নীচেকার নির্জন প্রপাতের ঝরো ঝরো শব্দে মন ছুটে চলে এই সব যাত্রীর সঙ্গে। এরা আজ একই গাছে বাসা বাঁধলো, কিন্তু ঠিক সময় বাসা ভেঙে উড়ে যাবে আপন আপন আকাশপথে। কে শুনছে দর্শ্ম-শাস্ত্রের আলোচনা, কে জানতে চাইছে আধুনিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কে ভাবতে বসেছে জড়বাদী বিজ্ঞানের গতি আর প্রগতি ? মুখে চোখে দেখি স্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গে বলিষ্ঠ উৎসাহের ভাব, পোষাকে পারিপাট্য, আলাপে আর আচরণে স্বভাব সরলতা। বেশ লাগছে এখানে বাঙ্গলাকে ভুলে থাকতে। ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে তাঁদের যারা একদিন এই মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন;

শীতের দিনের উৎসব, কমলালেবুর মাস, তাই এই সাহিত্য সম্মেলন এত প্রিয় হ'তে পেরেছে। খররৌদ্র জ্যৈষ্ঠের দিনে

প্রবাসী বাঙ্গালীকে ডাক দিলে কেউ আসতো না; শ্রাবণের দুর্যোগে ডাক দিলে সাড়া মিলতো না; পূজার সময় মেলা বসালে কেউ ফিরেও তাকাতো না। শীতের রৌদ্রে আসে মনের সক্রিয়তা; কমলালেবুর মধুর রসে পাওয়া যায় ছুটির আনন্দ। তখন সাহিত্য সম্মেলন হোক আর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হোক—সকলের মাঝখানে গিয়ে ভিড় জমাতে ভালোই লাগে। সাহিত্যকে তখন যদি কেউ লাঞ্ছনা করে, তবে তার নির্বুদ্ধিতাতেও আনন্দ পাওয়া যায়, নব্য সম্প্রদায়ের শিক্ষা আর সভ্যতাকে যদি কেউ চাবকায়, তাকে নিয়ে আমোদ করতেও ভালে লাগে।

আসল কথা, উৎসবটাই বড়, মেলামেশাটাই মধুর, খাওয়া দাওয়াটাই উৎসাহজনক এবং ভ্রমণ ক'রে বেড়ানোটাই আনন্দ-দায়ক। দিল্লী, মীরাট, ইন্দোর, পাটনা, রাঁচি—সব দেশেই এই একই কথা একই চেহারা। এক একটা অধিবেশন, এক একটা ভ্রমণের তালিকা। একজন দীর্ঘকাল ধ'রে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন,—এক সময় তিনি থামলেন। যেন সবাই বাঁচলুম। অমনি প্রেক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে ভ্রমণের দিকে পা চালিয়ে দেওয়া গেল। সব তামাসার মধ্যে প্রবন্ধপাঠও যেন একটা তামাসা। বক্তা আর শ্রোতার সঙ্গে যোগ হোলো কৌতুকের। সভাপতিরা গভীর অনুরাগের সঙ্গে তাঁর বক্তৃতা চালাচ্ছেন, আমরা কয় বন্ধু মিলে চুপি চুপি তাঁর পোষাক আসাক আর মুদ্রাদোষ নিয়ে হাসাহাসি করছি। তাঁর কথায় কান দেবার দরকার নেই, তাঁর দিকে চোখ মেলেই আমরা খুশি। একজন মহিলা উঠলেন কবিতা পাঠ করতে, আমরা হাসলুম তাঁর অঙ্গসজ্জা আর প্রসাধন পারিপাট্য দেখে। যাঁর গায়ে অমন শালের জামা, অমন জরীর শাড়ী, অমন কানের ঝুমকো, আর কণ্ঠস্বর যার অমন মিষ্ট, তিনি ত' ভালো কবিতা লিখবেনই। তিনি মস্ত কবি-প্রতিভা না হয়ে যাবেন কোথায়?

অমনি কানে কানে একজন বললেন, মহিলা কবি নয় হে, উনি কবি-মহিলা।

একজন ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি একেবারে জাব্বা জোব্বা। তাঁর প্রবন্ধ অতিশয় ভালো। এ প্রবন্ধ না লিখলে পৃথিবী অবশ্যই রসাতলে যেতো—সভাপতি বললেন। কী ভাষা, কী ভাব! প্রবন্ধটি বড়ই দীর্ঘ, তাঁর পরমায়ু অপেক্ষাও দীর্ঘ। পাশ থেকে চিম্‌টি কেটে অমনি মুখুজ্যে সাহেব বললেন, 'তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!' প্রবন্ধ শেষ হতেই চারিদিক থেকে, বাহবা! বিষয়বস্তুর জন্যে বোধ হয় নয়, প্রচেষ্টার জন্যে। কিন্তু আর নয়। একজন নেপথ্যে বললেন, টিফিনের সময় হোলো যে।

হল ঘরের মধ্যে শাসন, বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা। সাহিত্যের অধিবেশন নয়, রসালাপের বৈঠক। বৈঠকে আমরা যোগ দিই উপদেশ শুনতে নয়, গান-গল্প আর হাসি-তামাসার জন্যে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এর প্রচুর উপকরণ মেলে।

এরপর একদিন সব ভেঙ্গে যায়। হাটের পসারীরা যে যার চলে যায় প্রবাস জীবনের নিয়ম-তন্ত্রের বাঁধা পথে। আবার কোথায় দেখা হবে? কেউ বলে মাদ্রাজ, কেউ বলে আসাম, কেউ বা বলে মধ্যদেশে। কোথায়, ঠিক নেই, কিন্তু আসছে বছরে ঠিক দেখা হবে।

প্রধানত, যাঁরা ভ্রমণ করে থাকেন তাঁরা জানেন আমাদের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতকে কেন্দ্র করেই সারা ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে।

এই যেমন শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম। নীলনয়ন সাগরের উপকূলে হিন্দুগণের এই বিশাল মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই মন্দিরের কত জনশ্রুতি, কত উপকথা, কত রূপকথা, কত বীরত্ব, আর মানুষের কত মহিমা। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেখার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু ভ্রমণকারীর সমাগম হয়। যিনি জগন্নাথ তিনিই নারায়ণ, তিনিই বিষ্ণু। মহাসাগরের মত তাঁর মহিমা, সসাগরা পৃথিবীর দিকে তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু।

পুরী ছেড়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলে একটি আশ্চর্য প্রাকৃতিক রহস্য অনুভব করা যায়। উত্তর ভারতের বাঙ্গলা দেশে আমরা বাস করি। আমরা শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা—প্রত্যেকটি বিভিন্ন ঋতুর যাওয়া আসা বুঝতে পারি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দিকে গেলে দেখি অনেক জায়গায় শীতকালে বসন্ত, হেমন্তে বর্ষা, গ্রীষ্মকালে মধুর শীতের বাতাস। অতি সুন্দর লাগে, বিচিত্র মনে হয়।

আমি নভেম্বরের শেষ দিকে গিয়েছিলুম, ত্রিচিনোপল্লীতে দেখি শস্যশ্যামল প্রান্তরের দিগন্তে সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ছুটে আসছে। জানা গেল এটা বর্ষাকাল। ঋতুর এই ওলটপালটের কারণ প্রাকৃতিক ভূগোলের মধ্যে পাওয়া যায়।

মধ্য ভারতের দক্ষিণে যতদূর যাওয়া যায়, প্রায়ই পার্বত্য ভূভাগ। পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট ছাড়া বৃহৎ পর্বতমালা দাক্ষিণাত্যে নেই। পার্বত্য উপত্যকা—দাক্ষিণাত্যের প্রকৃত পরিচয়। বিশাল শস্যক্ষেত্র—অথচ অনেক স্থলে সেই ক্ষেত সমতল নয়,—হয়ত দেখা গেল কোনো পাহাড়ের সেটা গড়ানে অবস্থা—তরঙ্গায়িত হয়ে সেই ভূমি অন্য কোনো পাহাড়ের গাত্র অবধি চলে গেছে। এই সব শস্যময় উপত্যকার রং অনেক সময় মনে বিস্ময় আনে। আমি নিজে হায়দরাবাদ ভ্রমণ করেছি,

দেখেছি বাঙ্গলার মৃত্তিকার বর্ণের সঙ্গে ওদের মিল নেই। কোথাও গভীর হরিদ্রা বর্ণ মৃত্তিকা, কোথাও রক্তিম, কোথাও নীলাভ কৃষ্ণ। যতই উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, রং ততই সহজ হয়ে আসে। এটিও ভূগোল রহস্যের দ্বিতীয় কথা।

দক্ষিণ-ভারত অতিশয় হিন্দুয়ানীর দেশ। আর্যাবর্তের অস্পৃশ্যতা তবু সহনীয় কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্যতা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। শূদ্র অথবা হরিজনের কথা বাদ দিলাম, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভিতরেও এমন একটা জাতিভেদ যে, আমরা উত্তর ভারতবাসী হয়ে সে কথা কল্পনা করতে পারিনে। দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি প্রধানত ব্রাহ্মণেরই শাসনের অন্তর্গত। আমি নিজে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি অনেক তীর্থমন্দিরে দেবমূর্তির কাছাকাছি যাবার অধিকার পাইনি। উত্তর ভারতে মুসলমান প্রাধান্য, আমরা সেই হিন্দুস্থানবাসী—এই কারণে আমাদের জাতিগত পবিত্রতা সম্বন্ধে ভারতীয়গণের মনে গভীর সন্দেহ বর্তমান। দাক্ষিণাত্যের তুলনায় হিন্দুস্থান শীত প্রধান দেশ। শীতপ্রধান দেশের লোক অবশ্যই আমিষ ভক্ষণ করে,—বিশেষ বাঙ্গালীরা অতিশয় মৎস্য মাংসাষী—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দক্ষিণীরা অনেক স্থানে বাঙালাদের আশ্রয় দিতেও নারাজ হয়। আমি দশ বছর আগেকার কথা বলছি, আজ হয়ত তাদের বিচার অনেকটা উদার হয়েছে। মাদ্রাজ অথবা বোম্বাইয়ে হিন্দুর ধর্মশালায় বাঙ্গালীদের আশ্রয় পাওয়া অনেক সময় কঠিন। কারণ বাঙ্গালীরা মাছ খায়।

মধ্যভারতের পশ্চিমের নর্মদা ও তপতী নদী, পূর্ব দিকে মহানদী। এই মহানদী থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদী অবধি তীর্থস্থানের সংখ্যা কম, আছে অনেক কিন্তু তারা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য নয়। গোদাবরী নদীতে পুণ্যস্নান করা হয়, আমাদের

আচমনী মন্ত্রে গঙ্গা ও যমুনার পরই গোদাবরীর। স্থান গোদাবরীর তীরে বহু ছোট ছোট দেবমন্দির দর্শন করা যায়। অনেক স্থলে পর্ব উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

প্রথমে কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম করে যাই।

দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরম্ ভিন্ন মাদুরাই সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। উত্তর ভারতে যেমন কাশীধাম দক্ষিণে তেমনি মাদুরা। মাদুরায় পুণ্যকামী নরনারী বহু দেশদেশান্তর থেকে মীনাক্ষী মন্দির দর্শন করতে আসে।

মাদুরা শহর আধুনিক, কাশীধামকে যেমন পুরা ইতিহাস, সুপ্রাচীন সভ্যতা ও মন্দিরের বহু ভগ্নাবশেষ এবং সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান বলা যায়—মাদুরা এতটা না হলেও অনেকটা বটে। দক্ষিণ ভারতের যে অধ্যাত্ম সাধনা, প্রাচীন সভ্যতা ও শিক্ষা বহু যুগ থেকে প্রচলিত, মাদুরায় আমরা তাদের সাক্ষাৎ পাই। মাদুরা শহর আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক যানবাহন, আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রার আদর্শে জটিল হলেও একমাত্র মীনাক্ষী মন্দির এই শহরের দারিদ্র্য ও অভাবকে মহিমান্বিত করেছে। এই মীনাক্ষী মন্দিরের সামান্য পরিচয় শোনাবো।

শহরের কোলাহলের মাঝখানে এই বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আশেপাশে প্রকাণ্ড উদ্যান, চারিদিকে প্রকাণ্ড চত্বর—এই চত্বরে শত সহস্র যাত্রীর সর্বদা সমাগম হয়ে থাকে। প্রতি চত্বরের মধ্যস্থলে মন্দির প্রবেশের বিশাল তোরণ। ভিতরে প্রবেশ করো প্রথমে বিস্মিত হবে মন্দিরের শিল্পকলা দেখে। এক হাজারটি স্তম্ভের সাহায্যে এই মন্দির গঠিত—প্রতি স্তম্ভে কারুচিত্র খোদিত। সম্মুখে নাটমন্দির, সেখানে ব্রহ্মচারীরা বেদপাঠও গানে নিরত, মাঝে মাঝে লৌহঘণ্টায় মন্দিরের চারিদিক মুখরিত। প্রধান পূজারী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তিনি মাঝে মাঝে এসে দর্শন নিয়ে চ'লে যান।

মন্দিরের একটি বিশেষত্ব এই যে, শত শত স্তম্ভের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করতে গিয়ে অনেক সময়ে নূতন যাত্রী পথ হারিয়ে ফেলে। যেদিকেই ঘুরে দাঁড়ানো যায়, সেইদিকেই মনে হয় সম্মুখ দরজা। এতেই বুঝতে পারবো মন্দির নির্মাণের কৌশলটি কত বিচিত্র। মন্দিরের ভিতরটা কিছু অন্ধকার,—মূল মন্দিরের কথা বলছি। সেখানে ধূপ, ধুনা, ঘৃতধূপ, পুষ্পস্তবক ও রত্ন অলঙ্কারের আচ্ছাদনের ফাঁকে দেবীর দর্শন পাওয়া এই অসামান্য সৌভাগ্য বলতে হবে। এর উপরে আবার মণিকোঠার গুহায় অন্ধকার। কামরূপের কামাখ্যা দেবীর কথা মনে পড়ে।

ছবিতে দেখা যায় উত্তর ভারতের মন্দিরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির গঠনের কত তফাৎ। এর কারণ ইতিহাসে পাওয়া যাবে। উত্তর ভারতে অর্থাৎ আর্যাবর্তে প্রাচীনকাল থেকে নানাজাতির সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে। পাঠান ও মোগলের প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। গ্রীক এবং মধ্য এসিয়ার প্রভাবও কম নয়। এতে এই ফল দাঁড়িয়েছিল যে, ভারতের মন্দির-শিল্পীগণ নানা আদর্শের অনুসরণ করেছিলেন। আর্যাবর্তের মন্দিরগুলিতে যেমন তাজমহল, দিল্লী-আগ্রার দুর্গ, সম্রাটগণের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি মোগল রাজধানীগুলির বহু অট্টালিকা ও মস্‌জিদে প্রাচীন হিন্দু শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবেশিগণ যে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান করে থাকেন এ অতি জানা কথা।

কিন্তু দাক্ষিণাতেরে তীর্থমন্দির অথবা রাজকীর্তির উপরে দ্রাবিড় ও আর্যশিল্প ছাড়া আর কোনো শিল্পাদর্শের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না—সেইজন্য সকল বিষয়েই হিন্দুর সভ্যতা, শিক্ষা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের অনুস্যূত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন প্রকৃতভাবে কেবল দাক্ষিণাত্যেই মেলে। মীনাক্ষী মন্দির, শ্রীরঙ্গম্ কন্‌জিভরম্

—রামেশ্বরম্ যেখানে যাও দেখবে আদর্শ একই কেবল তার বিভিন্ন নির্মাণবিধি। মন্দিরের বিরাটত্বের যে কত বড় মহিমা, দাক্ষিণাত্যে না গেলে অনুভব করা যায় না। ধর্মবিষয়ে হিন্দুজাতির পরমসহিষ্ণু উদার দৃষ্টি মানুষের ভাব অনুভাবকে কখনো সঙ্কীর্ণ কল্পনার মধ্যে আনেনি—দক্ষিণ দেশে এলে জানা যায় হিন্দুর ধর্মচৈতন্য কতখানি ব্যাপক ও বিশাল।

জানি অস্পৃশ্যতার কথা উঠবে—সেটা কালক্রমিক সামাজিক আচারের কথা, ইতিহাস ওলট-পালটের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক প্রয়োজনের ভিতর থেকে উদ্ভূত—সেটা আজ আছে কাল থাকবে না। কিন্তু নিষ্কলুষ হিন্দুমনের বৃহৎ ধর্মের আদর্শটা সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী—আমার এই বিশ্বাস।

ভ্রমণকালে দাক্ষিণাত্যের নানা শহরে আরও বহু মন্দির—খ্যাত ও অখ্যাত—সবাই দেখতে পাবে।

মাদ্রাজ থেকে কিছু দূরে পক্ষীতীর্থ অবস্থিত। শহরের নাম চিঙ্গলপুট। ক্ষুদ্র পার্বত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দির, সেখানকার দেবতার প্রসাদের জন্য দুটি চিলজাতীয় পক্ষী নিয়মিত আসে। এই দুইটি পক্ষীকে নিয়ে সেখানে একটি উপকথা প্রচলিত। এই স্থানে বিশেষ পর্বে যাত্রীর ভীড় হয়ে থাকে।

এবার আমরা যাবো আরও দূর দক্ষিণে—ভারত মহাসাগরের দিকে—যেদিকে ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ রামেশ্বর ধাম। ত্রিচিনোপল্লীর পথ দিয়ে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—ট্রেনের নাম সিলোন-বোট-মেল অর্থাৎ লঙ্কাদ্বীপ যাত্রীর গাড়ী।

রামায়ণে আছে, রামচন্দ্রের সাগর বন্ধনের সময় মৈনাক পর্বত মাথা উঁচু করেছিলেন, যাতে সাগর বন্ধন সহজ হয়। রাত্রির পর প্রভাত কালে আমরা পাম্বানের নিকটে এলাম। সম্মুখে অথৈ নীল জলরাশি, সেই জলরাশির উপরে সেতু। এটা নদীও নয় সাগরও নয়—দুটোর মাঝামাঝি। জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল

তরঙ্গ দেখে মন উল্লসিত হয়ে উঠে। আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে সেতুর উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। এই সেতুর ভিত্তি জলের ভিতরকার ছোট ছোট পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত। নিকটে দূরে সর্বত্র কৃষ্ণকায় ছোট ছোট পাহাড় জলের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে রয়েছে। সেতুবন্ধনের এমন প্রাকৃতিক সুবিধা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। অনেক সময় এমন কথা মনে হয় রামেশ্বরম্ ও লঙ্কাদ্বীপ এক স্থলভাগের উপরেই ছিল, তার প্রমাণ শ্রীরামচন্দ্র দুবার সাগর বন্ধন করেন নি। যাই হোক পাম্‌বান সেতুর মত দীর্ঘ সেতু একমাত্র শোন-নদের পুল ছাড়া বোধ হয় ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

রামেশ্বরম্ একটি শহর—শহরের চারিদিকে বহু উষর প্রান্তর। এই প্রান্তর-বেষ্টিত শহর চারিদিকে সমুদ্র ও সমুদ্র-শাখার দ্বারা ভারত ভূমি থেকে বিভক্ত—রংছোড়নাথ নামক দেব মন্দিরের উপরে দাঁড়ালে আমার কথা প্রমাণিত হবে। সমগ্র শহর সামুদ্রিক বালুতে পরিবেষ্টিত—একথা বিশ্বাস করা চলে যে, এই শহরও একদিন সাগরের গর্ভে ছিল। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত হাওয়ায় শহরের বসতিগুলি নোনাধরা। শহর ও শহরবাসী অতিশয় দরিদ্র। একথা নিঃসন্দেহ যে, হিন্দুস্থানবাসী অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য-বাসীরা দরিদ্র। শহরের সকল দিকেই কলাবাগান ও নারিকেলকুঞ্জ। ফুল, ফল ও অন্যান্য শব্জির অভাব নেই। প্রধানত—যেমন সব তীর্থ স্থানেই দেখা যায়—মন্দিরকে কেন্দ্র করেই শহর গ'ড়ে উঠেছে। মন্দিরের আয়ব্যয়, যাত্রীর সমাগম এদের উপরেই শহরবাসীর আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে।

মনে পড়ে রামেশ্বরম্ মন্দির প্রবেশের প্রথম বিস্ময়। আমার মনে হয়, হিন্দু স্থাপত্যের এত বড় নিদর্শন ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই—পুরী, দ্বারকা, বৃন্দাবন, কাশী, মাদুরা—সব দেখেছি কিন্তু রামেশ্বর মন্দিরের দ্বিতীয় নেই। মহলের পর মহল,

দালানের পর দালান, বারান্দার পর বারান্দা—যেন বিশাল এক প্রাসাদের অন্দরমহলে বিরাট এক শহর। স্বর্ণমণ্ডিত দেবমূর্তি, সোনার হাতী, সোনার সিংহ, সোনার ময়ূর। পাণ্ডারা বলে স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্য এখানে স্তূপীকৃত। ভিতরে প্রাচীর গাত্রে, স্তম্ভে, পেটিকায়, ছাদে—চিত্র-ভাস্কর্য, অবর্ণনীয় কারুকলা—এই সব দেখতে দেখতে সমস্ত দিন যায়।

দেবমূর্তির নিকটে কারো যাবার অধিকার নেই, প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার মন্দিরের ভিতর দিকে চেয়ে প্রণাম জানাতে হয়। পূজা—নারিকেল ও গঙ্গাজল সহযোগে প্রশস্ত। ছোট একঘটি গঙ্গাজলের মূল্য পাঁচটাকা। শোনা গেল হিন্দুস্থান থেকে ট্রেনযোগে এখানে গঙ্গাজল আসে।

মন্দিরের দক্ষিণে একটি ছোট উদ্যান, তারপরেই দিকচিহ্নহীন সমুদ্র—তীরভূমি বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। যতদূর দেখা যায় কলা ও নারিকেল বন সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় সারাদিনমান মর্মরিত হচ্ছে। এখানে এই গগনস্পর্শী মন্দিরের নীচে মহাসাগরের উপকূলে বসে আর একবার মনে হলো হিন্দুতীর্থে দেববিগ্রহ দর্শন করাই বড় কথা নয়, কিন্তু যেখানে জলে স্থলে প্রকৃতির আশ্চর্য শোভা বিরাটের স্পর্শে মহিমামণ্ডিত হিন্দুজাতি সেই পরম সঙ্গমে চিরদিন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ।

যখন গ্রহণে স্পর্শ ও মোক্ষ লাগবে তখন আমরা ধনুস্কোডির সাগর সঙ্গমে পুণ্যস্নান করবো এই স্থির হোলো। এমন একটা সুযোগ যাত্রীর পক্ষে নাকি সৌভাগ্যের কথা। যাই হোক মধ্যাহ্নে আমাদের যাত্রা। সেই সিলোন্ বোট মেল—লঙ্কা-যাত্রীর গাড়ী। গাড়ী রামেশ্বর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চললো ধীরে ধীরে। রেলপথ এখানে খুব বেশি নিরাপদ নয়, কারণ এখানকার ভূমি বালুময়, ভিতরে দৃঢ়তা নেই। ঠিক মনে নেই, বোধ করি নয়

মাইল পথ। কিন্তু এই নয় মাইল পথ মন্থরগতিতে যেতে যেতে আমাদের যে দুরন্ত উল্লাস জেগেছিল তা অসামান্য। রেলের দুইদিকে—বামে ও দক্ষিণে সমুদ্র তরঙ্গ প্রায় আমাদের গাড়ীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। কোথাও কিছু নেই, চারিদিকের ঘন নীল সাগরের জলে আমাদের ট্রেন পরিবেষ্টিত। মনে হচ্ছে আমাদের গাড়ী পাতালপুরীর দিকে নেমে চলেছে।

অপরাহ্নে গাড়ী এসে থামলো ধনুস্কোডি স্টেশনে।

এইখানে সিংহলগামী জাহাজ যাত্রীর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। আমাদের গাড়ী জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল। যাত্রীদের নামিয়ে আবার আমাদের গাড়ী পিছনে হেঁটে সোজা দক্ষিণে গিয়ে এক জায়গায় থামলে আমরা নেমে পড়লাম।

আমরা তীর্থযাত্রী, চেহারাটা দারিদ্রভূষিত। সাগরের বালুচড়ায় তখন বালুর ঝড় বয়ে চলেছে—সেই ঝড়ের হাওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত আমরা বালুর ঝাপ্টায় ক্ষত বিক্ষত হতে হতে আরো দক্ষিণ দিকে চললাম, সাগরগর্ভের দিকে। আমাদের শরীরে বালুর কণা ছুঁচের মতো বিদ্ধ হতে লাগলো—আমরা চক্ষু বন্ধ ক'রে ঝড়ে বাতাসে ইতস্ততঃ টলতে টলতে চললাম। সেখানে কোথাও আশ্রয় নেই, গাছপালা নেই, মানুষ নেই, পশুপক্ষী নেই। চারিদিকে সাগরতরঙ্গের চীৎকার হিংস্র সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে আমাদের নিকটে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আরো নীচের দিকে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে আমরা নেমে চললাম। ক্রমে চন্দ্র দেখা দিল করালীভৈরবীর কপালে সোনার টিপের মতো। এক দিকে পশ্চিম সাগর সীমান্তে লোহিতবরণ সূর্যের অস্ত যাওয়া অন্যদিকে রজতবরণ পরিপূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব। সাগর ও পৃথিবীর সেই লাবণ্য দেখার জন্য আমি বালুর উপর বসে পড়লাম।

ক্রমে জ্যোৎস্না ঘন হোলো। চারিদিকে সাগরঝঞ্ঝা ও তরঙ্গের আর্তনাদ, তরঙ্গদলের অন্ধ, উন্মত্ত দাপাদাপি—আর

সীমাহীন সমুদ্রবক্ষে জলজ্যোতিষ্মান কোটি কোটি বৈদুর্যমণি, এদেরই ভিতর দিয়ে আবার একা আমি অগ্রসর হলাম। ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলে এসেছি, আমাকে যেন যেতে হবে পাতালের হিরণ্যগর্ভে।

পূর্ণিমার কোটালে আমার চারিদিকে যে জল ভ'রে উঠছে আগে খেয়াল করিনি, দেখিনি। দেখি যে-পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ সাগরের গর্ভে তলিয়ে গেছে, এবার আমাকে গ্রাস করবে। ভয়ার্তপদে দ্রুত অগ্রসর হলাম।

কিছুদূরে এসে এক বালিয়াড়ি পাওয়া গেল। কয়েক হাত মাত্র উঁচু একটা বালুর ঢিপি মাথা তুলে রয়েছে, একটি দ্বীপের মতো। তার উপরে নারিকেল পাতা ছাওয়া একটি বাঁকারির কুটীর, পাশে একটি নারিকেল বৃক্ষ। সেই ঘরে আশ্রয় পেলাম। ভিতরে একটি মিটমিটে আলো, সেই আলোয় দেখা গেল রাম সীতা ও লক্ষ্মণের তিনটি বিগ্রহ। আমি দরজার ধারে লোটা ও লাঠি রেখে বসে পড়লাম।

এই ক্ষুদ্র স্থানটুকুতে একদা শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন পড়েছিল —পাণ্ডার এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হলো না। সেই ত্রেতাযুগে লঙ্কাবিজয় যাত্রায় এসে রামচন্দ্র প্রথম সমুদ্রের মহিমা দেখে এই স্থানে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বালুর উপরে বসে পড়েছিলেন।

চারিদিকে তরঙ্গের শব্দ, জ্যোৎস্নায় উদ্বেলিত মহাসাগর, বালুর ঝড়ে দোলায়মান এই পর্ণকুটীর,—পৃথিবীর চিহ্ন অবলুপ্ত —এদেরই মধ্যস্থলে একবিন্দু প্রাণচেতনা নিয়ে আমি ক্ষুদ্র মানুষ নীরবে বসে রইলাম।